ফাদার দ্যতিয়েন

অনূদিত

ছোট রাজকুমার

ল্য প্যতি প্র্যাঁস্

আঁতোয়ান্ দ্য স্যাঁতেক্‌স্যুপেরি

সঙ্গে লেখকের নিজের আঁকা ছবি

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং

১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
অনিলকুমার সরকার
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

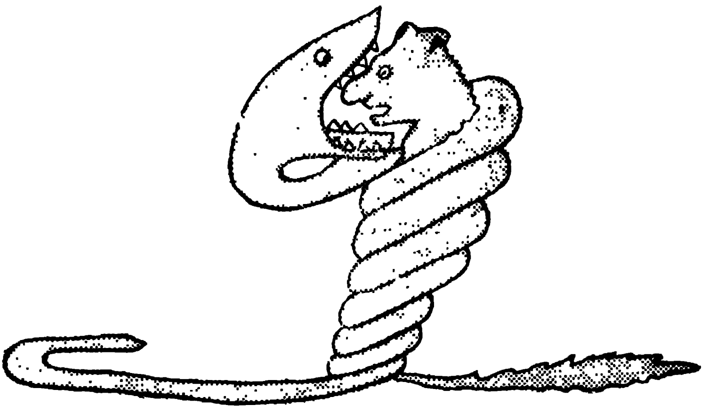
প্রকাশ : ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬

লেওঁ ভের্‌ৎ-এর করকমলে

ছোটদের কাছে ক্ষমা চাইছি এ বইটি এক বয়স্ককে উৎসর্গ করেছি ব'লে। যুক্তি অবশ্য আছে, মূল্যবান যুক্তি···· ঐ বয়স্ক মানুষটি আমার প্রাণের বন্ধু। আরো কাছে—উনি সব বোঝেন, ছোটদের জন্য লেখা বই পর্যন্ত। তার উপর উনি সেই সুদূর ফ্রান্সে—ক্ষুধায়, শীতে দিন কাটাচ্ছেন, সান্ত্বনা দরকার। এত যুক্তিতেও যদি না কুলোয়, উৎসর্গ-পত্রটিকে আমি সংশোধন ক'রে লিখব, "ছোট ছিলেন যখন, তখনকার সেই লেওঁ ভের্‌ৎ-কে"। বয়স্কমাত্রই তো একদিন ছোট ছিল, অনেকে যদিও, হায়, ভুলে গিয়েছে সে-কথা।

—আঁতোয়ান্‌ দ্য স্যাঁতেক্‌সুপেরি

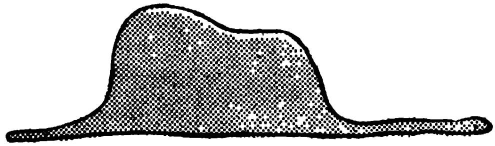


এক

আমার বয়স ছিল যখন পাঁচ কি ছয়, একদিন 'অরণ্যের গল্পমালা' ব'লে এক গ্রন্থে একটা আশ্চর্য ছবি দেখেছিলাম— এক বোড়া সাপ গোটা এক বুনো জন্তুকে গিলে ফেলছে, তার ছবি।

ছবির নিচে লেখা ছিল: "অজগর সর্প চর্বণ না করিয়া মৃগয়ালব্ধ প্রাণীদিগকে গলাধঃকরণ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। অতঃপর গাত্রোত্থান করিতে অসমর্থ হইয়া, পরিপাক করিতে করিতে অর্ধবৎসরব্যাপী নিদ্রা যায়।"

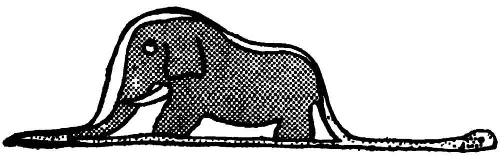
চিন্তা করেছি কত—জঙ্গলে সংঘটিত সব ট্রাজেডির কথা। তারপর আমিও লেগে গেলাম কাজে, আমার প্রথম আঁকা আঁকলাম, রঙ-পেন্সিলে। আমার এক-নম্বর আঁকা। এই দেখুন :



আমার এই এক-নম্বর শিল্পকার্য বয়স্কদের দেখালাম; জিগ্যেস করলাম, ওরা ভয় পাচ্ছে কি না।

ওরা বলল, "টুপি দেখে লোকে ভয় পায় ?"

ছবিটা কিন্তু টুপির নয়; ছবিটা ছিল এক হাতি-গিলে-ফেলা বোড়া সাপের ছবি। আমি তখন বোড়ার ভিতরটাও আঁকলাম, বয়স্কদের যাতে বোঝার অসুবিধে না হয়। ওরা ব্যাখ্যা ছাড়া কিছুই বোঝে না কিনা! দেখুন এবার আমার দু-নম্বর ছবি :



৩

বয়স্কেরা তখন বন্ধ কি খোলা বোড়ার ছবি ত্যাগ ক'রে অঙ্ক ও ব্যাকরণ, ভূগোল ও ইতিহাসে মন দেওয়ার আদেশ দিল। এমনি ভাবে, ছয় বছর বয়সে, মহাশিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়তে হল। আমার এক-নম্বর আর দু-নম্বর ছবির অসাফল্যে নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। বয়স্কেরা তো আপনা থেকে কিছু বোঝে না; সর্বদাই ওদের ব্যাখ্যা চাই— আর, জানেন, ব্যাখ্যা দিতে দিতে ছেলেদেরও একেক সময় ক্লান্তি লাগে।

অন্য চাকরি খুঁজতে হল। প্লেন চালাতে শিখলাম। উড়ো-জাহাজে ঢুঁড়ে ফিরেছি সারা পৃথিবী। আর. সত্যি, ছেলেবেলার এই ভূগোল-শেখাটা আমার কাজে লেগেছে খুব। চীন ও অরিজোনা-কে চিনতে পারতাম এক নিমেষেই। রাত্রে মাঝ-আকাশে পথ হারালে ভূগোল-বিদ্যার মূল্য আছে!

আমার এই এরোপ্লেন-চালকের জীবনে কত কত মস্ত লোকের সঙ্গে কত কত সাক্ষাৎ ঘটেছে। বয়স্কদের সঙ্গে ঘন ঘন মেলামেশা করেছি। ওদের চালচলন লক্ষ্য করেছি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। আর তবু ওদের বিষয়ে ছেলেবেলায় যে মতটা পোষণ করতে শিখেছিলাম, সেটাকে বদলাবার কখনো দরকার বোধ করি নি।

কোনো ঈষৎ-উজ্জ্বল-মস্তিষ্ক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলে, ওকে দেখাতাম আমার সযত্নে রক্ষিত এক-নম্বর ছবি। রীতিমতো উত্তর পেতাম: "টুপি"। ফলে বোড়া সাপ, বন-জঙ্গল আর তারা-নক্ষত্রের কথা না পেড়ে, নিজেকে ওর সঙ্গে খাপ খাইয়ে বলতাম ক্রিকেট ও তাস-খেলা, জামা-কাপড় আর রাজনীতির কথা। আর বয়স্ক লোকটি এত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্যে আনন্দবোধ করত খুব।

দুই

এমনিভাবে, মন খুলে কথা বলার মতো কাউকে না পেয়ে, কাটিয়েছি এক নিঃসঙ্গ জীবন। একদিন—আজ হল ছ'বছর—প্লেনটাকে নামাতে হল সাহারা-র মরুপ্রান্তরে। ইঞ্জিনে কি একটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। মিস্ত্রি-ও ছিল না, যাত্রী-ও ছিল না। বিগড়ে-যাওয়া মোটরটাকে একা-ই সারাতে লাগলাম। জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম। সঙ্গে ছিল আট দিনের মতো জল।

প্রথম সন্ধ্যায় শুয়ে পড়েছিলাম বালুকায়, লোকালয় থেকে এক হাজার মাইল দূরে। একা···মধ্যসাগরে জাহাজ ডুবলে, কলাগাছে ভাসমান এক নাবিকের মতো একা। তখন—আমার বিস্ময় দেখে কে!—ঘুম ভাঙল ভোরে অদ্ভুত একটা কচি কণ্ঠের স্বরে। কে যেন বলছিল:



৭

—দোহাই তোমার, আমার জন্য এঁকে দাও একটা ভেড়া।

—অ্যাঁ ?...

—এঁকে দাও একটা ভেড়া।

লাফিয়ে উঠলাম, ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো। চোখ দুটো রগড়ালাম। ভালো ক'রে চেয়ে থাকলাম। দেখলাম—আমার দিকে তাকাচ্ছে, গম্ভীরভাবে তাকাচ্ছে কোত্থেকে-এসে-পড়া এক শিশু। এই দেখুন ওর ছবি। ওর অনেক ছবি এঁকেছি আমি—পরে অবশ্য। এটি কিন্তু বেস্ট। মডেল্‌টা নিশ্চয়ই আরো অনেক সুন্দর ছিল। কিন্তু কি করি, বলুন ? আমি তো ছয় বছর বয়স থেকে আর তুলি ধরি নি ; বয়স্কেরা-ই আমাকে নিরুৎসাহ করেছিল ; কিছুই আঁকতে শিখি নি আমি, ওই বন্ধ আর খোলা বোড়া সাপের ছবি ছাড়া।

তাকিয়ে রইলাম, হতভম্ব হয়ে। আমি তখন, মনে রাখবেন, লোকালয় থেকে হাজার মাইল দূরে। শিশুটিকে কিন্তু পথহারা দেখাচ্ছিল না, ক্ষুধার্ত কিংবা তৃষ্ণার্ত-ও নয়, ক্লান্ত কিংবা ভয়ার্ত-ও নয়। মধ্যমরুতে, লোকালয় থেকে এক হাজার মাইল দূরে হারিয়ে গেলে কোনো মানবশিশুর ঐ নির্লিপ্ত ভাব কি মানায় ? অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম ঃ

৮

—এখানে কি করছ ?

ও কিন্তু কথাটা কানে না তুলে অতি মৃদুভাবে প্রয়োজনের স্নুরে আবার বলল :

—দোহাই তোমার, আমার জন্য এঁকে দাও একটা ভেড়া।

রহস্য ঘনিয়ে উঠছে দেখে আশ্চর্য শিশুটির এই অদ্ভুত আবদার অগ্রাহ্য করতে সাহস পেলাম না। আমার ব্যবহার যত অসঙ্গত ও হাস্যকর ঠেকুক না কেন, তবু লোকালয় থেকে এই এক হাজার মাইল দূরে—আর মরণাপন্ন অবস্থায়—পকেট থেকে কাগজ ও ঝর্ণা-কলম বার করলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, আমি তো অঙ্ক ও ব্যাকরণ, ভূগোল ও ইতিহাস শিখেছি, আঁকতে শিখি নি। তাই শিশুটিকে একটু রূঢ়স্বরেই বললাম :

—আঁকতে আমি জানি না।

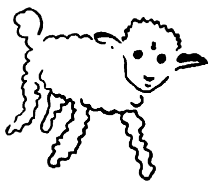
—তাতে কি ? দাও না এঁকে একটা ভেড়া···

আর কি করি, বলুন ? জীবনেও ভেড়া আঁকি নি আমি ; এঁকে দিলাম আমার এক-নম্বর ছবি, বন্ধ বোড়া সাপের ছবি। শিশুটি তখন আমাকে স্তম্ভিত ক'রে বলল :

—না, না, বোড়ার-মধ্যে-হাতি চাই না। বোড়া তো বড় ডেঞ্জারাস্, আর হাতি, জানো, বড় গোবদা ! আমার

ওখানে, জানো, সব কিছু খুব ছোট্ট। আমার একটা ভেড়া চাই…। দোহাই তোমার, আমার জন্য এঁকে দাও একটা ভেড়া।

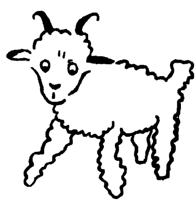
বাধ্য হয়ে আঁকলাম :



মন দিয়ে সে দেখল। বলল :

—বড্ড রোগাটে যে…আর একটা আঁকো।

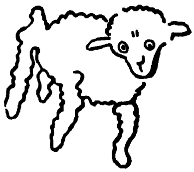
আবার আঁকলাম :



ও কিন্তু সহানুভূতির স্মিতহাসি হেসে বলল :

—ভেড়া তো নয়…রামছাগল! শিং আছে, দেখছ না?

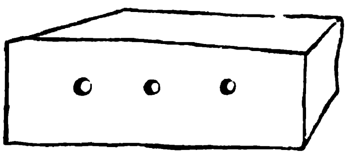
আর একটা আঁকলাম :



তবে সেটাও পছন্দ হল না :

—বুড়ো খুব !···বাঁচবে না বেশি দিন।

ধৈর্য হারিয়ে, মোটর সারানোর কাজে দেরি হয়ে যাচ্ছে দেখে ঘচ্ ঘচ্ ক'রে আঁকলাম :



বললাম :

—দেখ, বাক্স। ভেড়া আছে বাক্সের মধ্যে।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, শিশুটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে :

—ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম। কত ঘাস লাগবে, বলতে পারো ?

—কেন ?

—আমার ওখানে, জানো, সব কিছু খুব ছোট্ট।

—ভেবো না। তোমাকে দিয়েছি একটা খুব ছোট্ট ভেড়া।

ছবির উপর ঝুঁকে প'ড়ে শিশুটি বলল ঃ

—তত ছোট তো নয়! দেখ···ঘুমিয়ে পড়েছে।

এমনিভাবেই ছোট রাজকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।



তিন

ওর আত্মকথা জানতে বেশ একটু সময় লাগল। ও ভো প্রশ্ন করত খুব, উত্তর প্রায় দিত না। তবে খণ্ড খণ্ড

আলাপের ভিতর দিয়েই ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল ওর পরিচয়। এই ধরুন, প্লেনটাকে ও যখন দেখল [না, প্লেন আমি আঁকব না, প্লেন আঁকা বড় জটিল], ছোট কুমার জিগ্যেস করল :

—জিনিসটা কি ?

—জিনিস নয়। উড়ে যায়। এরোপ্লেন। আমারই এরোপ্লেন···

ব'লে মনটা ভ'রে উঠল তৃপ্তিতে আর গর্বে।

—ও !···আকাশ থেকে পড়েছ তুমি ?

—হ্যাঁ···আমি বললাম বিনীত কণ্ঠস্বরে।

—কি মজা !

ব'লে ছোট কুমার খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। বিরক্তি লাগল খুব। আমার দুর্যোগ নিয়ে লোকে যে ঠাট্টা করবে, তা আমার সইবে না। ছোট কুমার আবার বলল ঃ

—তাহলে তুমিও আকাশবাসী ? তোমার গ্রহ কোথায় ?

'দেশ' বলল না, বলল 'গ্রহ'। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, পেয়েছি ওর আবির্ভাবের রহস্যের সন্ধান। সোজা প্রশ্ন করলাম ঃ

—তুমি তাহলে আরেক গ্রহের, বুঝি ?

ও কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে মাথা নেড়ে প্লেন দেখিয়ে বলল ঃ

—এ-রকম বাহনে তুমি যে অনেক দূর থেকে আসতে পারো নি, তা প্রথম থেকেই আমার বোঝা উচিত ছিল…

বলে' সে অনেকক্ষণ নীরব থাকল, যেন সমাধিস্থ হয়ে। পরে আমার ভেড়া-আঁকা কাগজটা পকেট থেকে বের ক'রে তারই ধ্যানে নিমগ্ন হল।

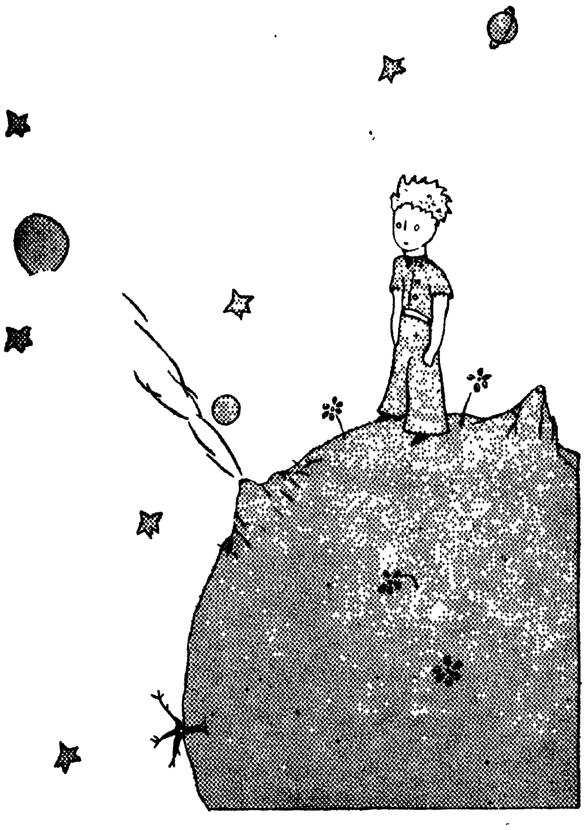
রাজকুমারের মুখে শোনা সেই 'অন্য গ্রহদের' ইঙ্গিত আমার মনে যে কত কৌতূহল জাগিয়েছিল, তা আপনারা বুঝতেই পারছেন। স্থির করলাম, ওর কাহিনী-রহস্যের উদ্‌ঘাটন করব।

—কোত্থেকে এসেছ, সোনা? আর ঐ যে তুমি বলছ "আমার ওখানে", কোথায় সেটা? আর ভেড়াটাকে নিয়ে যাচ্ছ-ই বা কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে সে উত্তর দিল না, চুপ ক'রে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মৌন ভেঙ্গে বলল:

—বাক্‌স-ও দিয়েছ, ভালোই করেছ; রাত্তিরে ওর খোঁয়াড়ের কাজ করবে।

—নিশ্চয়ই। আর তুমি লক্ষ্মী ছেলে হলে, দিনের বেলা ওকে বেঁধে রাখার দড়িও তোমাকে দেব। আর, একটা খুঁটি।



ছোট রাজকুমার আমার এই প্রস্তাবে ভারি অপ্রতিভ হয়ে গেল ঃ

—বলো কি ? বেঁধে রাখব ?

—তবে না তো কি ? না বাঁধলে যে কোথাও যাবে পালিয়ে ! হারিয়েও যেতে পারে।

—কিন্তু···যাবে কোথায় ?···

ব'লে ছোট রাজকুমার একগাল হাসি হাসল।

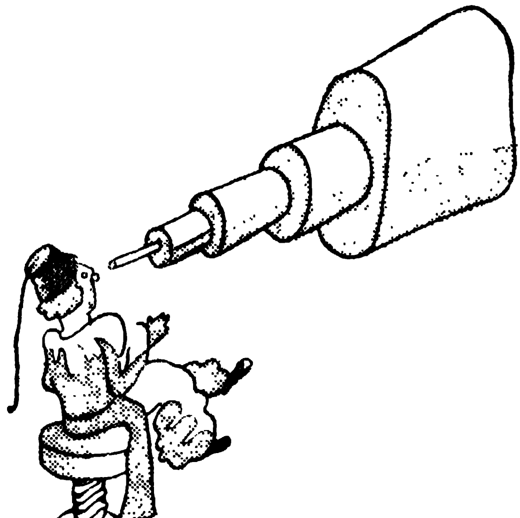
—কেন ? সোজা-ই যাবে···নাক বরাবর।

ও তখন গম্ভীর স্বরে বলল ঃ

—আমার ওখানে তো জানো, সব কিছু খুব ছোট্ট···

তারপর একটু যেন বিষাদ-মাখা সুরে ঃ

—সোজা গেলে বেশি দূর যাওয়া যায় না···



চার

এমনিভাবে ওর বিষয়ে আরেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করেছিলাম: ওর মাতৃগ্রহটি একটা বাড়ির চেয়ে বেশি বড় নয়।

এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার বিশেষ কিছু দেখছি না। জ্যোতিষে পড়েছি, পৃথিবী, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র প্রভৃতি নামজাদা গ্রহ ছাড়া শত শত অনামী গ্রহ আছে, যেগুলির অস্তিত্ব দূরবীনেও সহজে ধরা পড়ে না। ও-রকম এক গ্রহ আবিষ্কার করলে, জ্যোতির্বিদ্ সংখ্যা দিয়েই ওর পরিচয় দেয় ; ওর নাম রাখে—এই ধরুন—৩২৫১-নম্বর নক্ষত্র।

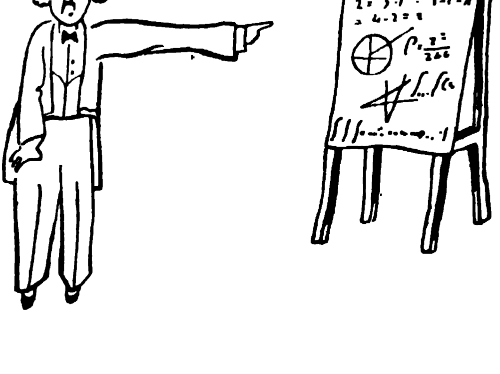
আমার ব্যক্তিগত সুচিন্তিত ধারণাঃ বি-৬১২ নক্ষত্র-ই ছোট রাজকুমারের মাতৃগ্রহ। ঐ নক্ষত্রটি মাত্র একবারের জন্যই ধরা দিয়েছে—১৯০৯ সালে—এক তুর্কী জ্যোতিষীর দূরবীনে।

ভদ্রলোকটি জ্যোতির্বিদ্যার আন্তর্জাতিক এক সম্মেলনে বড় বড় অঙ্ক ক'ষে নক্ষত্রটির অস্তিত্ব প্রমাণসিদ্ধ করেছিলেন।



তাঁর যুক্তিমালা কিন্তু কেউ-ই মানল না—তাঁর বিদেশী উষ্ণীষ আর পাজামার জন্য। বয়স্কেরা, জানেন, পোশাক দেখেই বিচার করেন।

বি-৬১২ নক্ষত্রের ভাগ্য ছিল ভালোঃ একদিন, তুরস্কের এক স্বেচ্ছাচারী সম্রাট, প্রাণদণ্ডের ভয় দেখিয়ে, তাঁর রাজ্যময় আবালবৃদ্ধবনিতাকে আদেশ দিলেন য়ুরোপীয় পোশাক পরতে। ফলে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে, ওই একই তুর্কী জ্যোতিষী, প্যাণ্ট-কোট প'রে তাঁর আবিষ্কৃত নক্ষত্রের অস্তিত্ব আরেকবার প্রমাণ করলেন। এবার কিন্তু শ্রোতৃবর্গ জ্যোতিষীর মত গ্রহণ করল সর্বসম্মতিক্রমে।



এই বি-৬১২ নক্ষত্র-সংশ্লিষ্ট সংখ্যাবহুল তথ্যগুলিকে অপ্রাসঙ্গিক ব'লে কেউ যেন মনে না করেন। বয়স্কদের জন্যই লিখেছি। বয়স্কেরা সংখ্যাপ্রিয়। ধরুন, আপনি আপনার এক বন্ধুর পরিচয় দিতে যাচ্ছেন। ওরা কোনো প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিগ্যেস করবে না। বলবে না: "ওর গলার স্বর কেমন, ও কি খেলতে ভালোবাসে, প্রজাপতি ধ'রে রেখে জমায় কি না?..." শুধু জিগ্যেস করবে: "ওর বয়স কত, ওর ওজন কত, ওরা ক'ভাই? বাবার কত মাইনে?..." এ-সব প্রশ্নের উত্তর পেলে তবেই ওরা ভাববে, লোকটিকে জানা হল বটে। মনে করুন, বয়স্কদের কাছে গিয়ে বলেছেন, "দেখেছি এক সুন্দর বাড়ি: ইট গোলাপী রঙের; জানালায় ফুলের টব, ছাদে পায়রা..." ওরা কি পারবে বাড়িটার সৌন্দর্য কল্পনা ক'রে নিতে? উঁহু, পারবে না। এদিকে যদি বলেন, "দেখেছি লক্ষ টাকার এক বাড়ি..." সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ব'লে ওঠে, "তা-ই না কি? এত সুন্দর?"

কাজেই আপনি যদি বলেন, "ছোট রাজকুমারের অস্তিত্বের প্রমাণ এই যে, ও ছিল চিত্তহারী এক শিশু, ও শুধু খিল খিল ক'রে হাসত, আর—আমার কাছে চেয়েছিল ও এক ভেড়া...ভেড়া যারা চায়, তাদের অস্তিত্ব কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে?" বয়স্কেরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলবেন, 'ছেলেমানুষের মতো

কথা' না বলতে। কিন্তু আপনি যদি বলেন, "রাজকুমারের মাতৃগ্রহ ছিল বি-৬১২ নক্ষত্র," তবে ওরা সম্মতি জানাবে, কোনো প্রশ্ন নিয়ে আপনাকে আর বিরক্ত করবে না। এই হল বয়স্কেরা! ছোটরা যেন কিছু মনে না করে, ওদের একটু-আধটু প্রশ্রয় দেয়, ধৈর্য দেখায়।

আমরা কিন্তু—বুঝি যারা জীবনের অর্থ—কেয়ার করি না সংখ্যার। ইচ্ছে ছিল, গল্পটিকে ঢালি রূপকথার ছাঁচে; ইচ্ছে ছিল, বলি: "এক যে ছিল ছোট রাজকুমার, দূরদেশী এক গ্রহে। গ্রহটি ছিল ছোট্ট খুব; কুমারের বন্ধু ছিল না…" লেখাটা তাহলে আরো বেশি 'সত্য' ব'লে মনে হত—বোঝে যারা জীবনের অর্থ, তাদের কাছে।

আমি চাই না, লোকে আমার বই পড়বে আর প'ড়েই উড়িয়ে দেবে। জানেন, ঐ দিনগুলির স্মৃতিস্তূপে আঁচ ধরাতে কত শোক লাগে অন্তরে? আজ হল ছয় বছর, ভেড়া নিয়ে বিদায় নিয়েছে বন্ধু। ওকে ভুলতে চাই না ব'লেই ওর ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছি। আর-কি দুঃখ আছে, বলুন, বন্ধুকে ভোলার দুঃখের মতো? কজনেরই বা আছে বন্ধুভাগ্য?…আর আমি-ও তো বয়স্কদের মতো হয়ে যেতে পারি, অঙ্কের সংখ্যায় যাদের বিলাস। জানেন, আমার মতো বয়সে আবার আঁকতে শুরু করা কত কঠিন! বিশেষ

ভাবে আমি যে জীবনে আর কিছুই আঁকি নি, ঐ বন্ধ ও খোলা বোড়া সাপের ছবি ছাড়া—ঐ সেই ছ-বছর বয়সে। চেষ্টা করব তবু, চেষ্টা করব আমার আঁকা ছবিগুলিতে যথাসম্ভব ওর সাদৃশ্য রাখতে। পুরোপুরি পারব কি না, ঠিক জানি না। একটা পারি তো, পরেরটা আর পারি না। তারপর আছে সাইজের সমস্যা। এটাতে, দেখুন, ছোট কুমারকে অতিরিক্ত লম্বা দেখায়, আর ওটাতে অতিরিক্ত বেঁটে! পোশাকের রঙ নিয়েও ইতস্ততঃ করি খুব। মুছে, ছিঁড়ে, এঁকে এঁকে ছেড়েছি সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিচ্ছবির আশা। কিন্তু কি করি বলুন, আমার বন্ধু তো কোনো কিছুরই ব্যাখ্যা দিত না। ভাবত বুঝি—আমিও ওরই মতো। আমার কিন্তু, হায় রে, বাক্সের মধ্যে ভেড়া দেখার মতো চোখ নেই। বুঝি-বা বুড়িয়েছি।

পাঁচ

দিনের পর দিন একটু একটু ক'রে শুনতে পেলাম রাজকুমারের গ্রহের কথা, প্রস্থানের কথা, অভিযানের কথা। ধীরে ধীরে, কথাবার্তার ছলে। এমনিভাবে তৃতীয় দিনের দিন উদ্‌ঘাটিত হল অশ্বত্থোৎপাতের ট্রাজেডি।

এবারও উপলক্ষ্যটি ছিল ছোট রাজকুমারের ভেড়াটা। সেদিন সে দুম ক'রে জিগ্যেস করেছিল, সন্দেহ-ভরা কণ্ঠে :

—আচ্ছা···ভেড়ারা তো গাছড়া খায়, তা-ই না ?

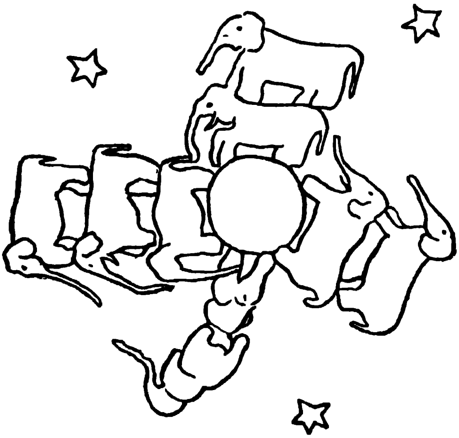
—খায় বৈ কি।

—যাক্ বাঁচা গেল !

ভেড়ারা যে গাছড়া খায়, কথাটার তাৎপর্যটা আমি বুঝতে পারছিলাম না। ছোট কুমার আবার বলল :

—তাহলে অশ্বত্থ গাছও খায় ?

ছোট কুমারকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, অশ্বত্থ গাছড়া নয়, গির্জের মতো বিরাট গাছ। একটা অশ্বত্থকে মুড়োনো কোনো আস্ত হস্তীযূথেরও কম্মো নয়।



হস্তীযূথের কথাটা শুনে ছোট কুমার হেসে উঠল ঃ

—ওদের পরস্পরের পিঠে দাঁড় করাতে হত !···

তারপর বিজ্ঞের মতো বলল ঃ

—অশ্বথ গাছ বড় হওয়ার আগে বুঝি ছোট হয় না ?

—হবে না কেন ?···কিন্তু ভেড়া অশ্বথের চারা খেলেই বা তোমার কি লাভ ?

—বাঃ, দেখছ না ?

ব্যাপারটা তার কাছে যত স্বতঃসিদ্ধ হোক না কেন, একা একা বুঝতে কিন্তু আমার অনেক সময় গেল।

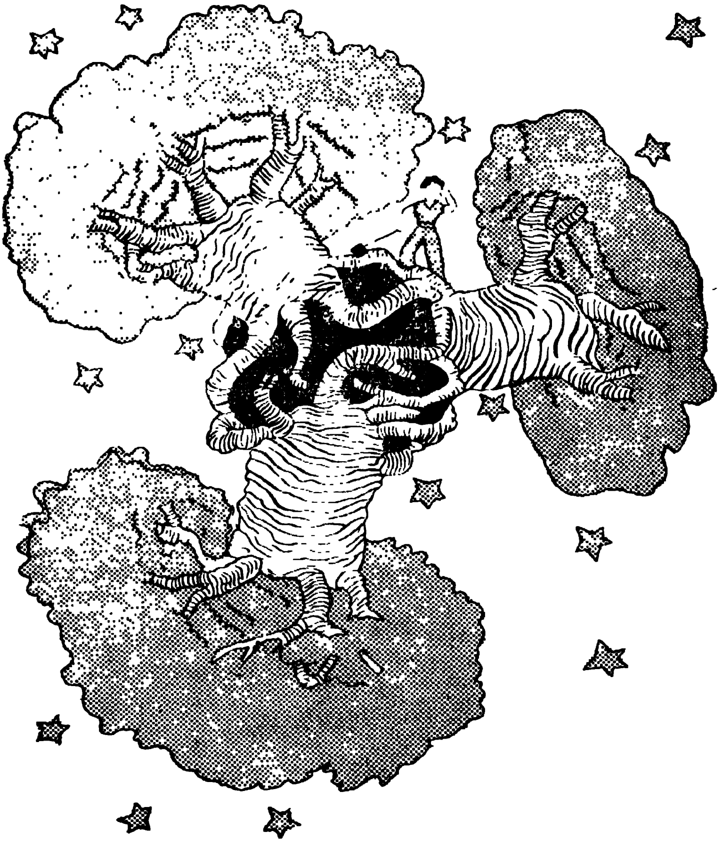
রাজকুমারের গ্রহে—যাবতীয় গ্রহে যেমনটি হয়—ভালো গাছ-ও ছিল, খারাপ গাছ-ও ছিল। ছিল ভালো গাছের ভালো বীজ, খারাপ গাছের খারাপ বীজ। বীজ কিন্তু অদৃশ্য। মাটির গর্ভে ঘুমিয়ে থাকে, যতক্ষণ-না তার ঘুম-থেকে-জেগে-ওঠার খেয়াল হয়। তখন সে আড়ামোড়া ভাঙ্গে, এবং কিছুটা লজ্জিত হয়ে, সূর্যের অভিমুখে ঠেলে দিতে থাকে চিত্তহারী এক অনাপত্তিকর অঙ্কুর। মুলোর কিংবা গোলাপের অঙ্কুর হলে ওকে খুশিমতো বাড়তে দেওয়া যেতে পারে।



খারাপ গাছ হলে কিন্তু, গাছটাকে চেনামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে উপড়ে ফেলা দরকার। রাজকুমারের গ্রহে ভয়াবহ বীজ ছিল—অশ্বত্থের বীজ। অশ্বত্থের বীজ গ্রহটির মাটিতে রীতিমতো ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ ধরনের গাছের বেলায় কিন্তু দেরি করলে চলবে না; অশ্বত্থ যেই অঙ্কুরিত হয়েছে, ওকে উপড়ে না ফেললে ওর কবল থেকে রেহাই নেই। সারা গ্রহে ও ছড়িয়ে পড়বেই। তার শিকড় গ্রহের মাটির তলায় সেঁধিয়ে যাবেই। এবং, এমন কি, গ্রহটি ছোট হলে—কিংবা অশ্বত্থের সংখ্যাবাহুল্যের দরুন—গ্রহটি ফেটেও যেতে পারে।

—শৃঙ্খলা চাই···ছোট রাজকুমার বলেছিল একদিন। প্রতিদিনই নিজের প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে গ্রহেরও প্রসাধনে হাত দেওয়া দরকার। নিয়ম-মতো—যত শীঘ্রই ধরা পড়ে—অশ্বত্থের চারা উপড়ে ফেলতে হয়। তবে সতর্কতার প্রয়োজন: অশ্বত্থ ও গোলাপের চারায় আশ্চর্যভাবে মিল। কাজটা বড় একঘেয়ে, কিন্তু খুব একটা কঠিন নয়।

একদিন ও আমাকে বলেছিল আঁকার দ্বারাই ব্যাপারটাকে বোঝাতে—এখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে আর না ভোলে। "ওরা যদি কোনোদিন গ্রহভ্রমণে বেরোয়, বিদ্যাটা কাজে লাগবে। এমন কাজ আছে যা মুলতুবি রাখলে চলে। অশ্বত্থের উন্মূলন স্থগিত রাখলে কিন্তু, সর্বনাশ! এক গ্রহ-কে



জানি, সেখানে এক অলস ছেলে বাস করে। সে তিনটি অশ্বত্থ-চারা তুলতে ভুলে গিয়েছিল…”

রাজকুমারের নির্দেশ মতো ঐ গ্রহটিকেই এঁকেছি আমি। উপদেশ দেওয়া আমার ধাতে সয় না, আর তবু, অশ্বত্থের বিপদ বোঝে এমন লোক এখনও এত ভয়াবহভাবে অল্প, কোনো গ্রহে ঘুরতে গেলে সঙ্কট এত প্রভূত, যে—এই একমাত্র ক্ষেত্রে—আর নীরব থাকতে পারি না, চেঁচিয়ে উঠি: “বালকগণ, অশ্বত্থোৎপাত থেকে সাবধান!”

আমার বন্ধুরা যে-বিপদের মধ্যে—নিজেদের, আর আমারও, অজান্তে—এত দিন বাস করত, সেই বিপদের বিষয়ে ওদের সতর্ক করার জন্যই ঐ ছবিটা আঁকতে এত খেটেছি আমি। শিক্ষাটা জরুরি ছিল যে!

আপনারা বোধ হয় জিগ্যেস করবেন, আমার এই বইটায় অশ্বত্থোৎপাতের মতো মর্মস্পর্শী আর কোনো ছবি আঁকি নি কেন? উত্তরটা সোজা: পারি নি। চেষ্টা ক'রেও পারি নি। অশ্বত্থোৎপাত আঁকার বেলায় প্রণোদিত ছিলাম উপযোগিতার তাগিতে।



ছয়

কুমার, ছোট রাজকুমার আমার, ধীরে ধীরে বুঝতে শিখেছি তোমার বিষাদ-মাখা হাসি। এতদিন সূর্যাস্ত-মাধুর্যই ছিল তোমার একমাত্র বিনোদন। এ তথ্যটি চতুর্থ দিনেই শিখেছি। তুমি বলেছিলে ঃ

—সূর্যাস্ত দেখতে আমার কত ভালো লাগে! এসো·· সূর্যাস্ত দেখে আসি।

—কিন্তু···দেরি আছে যে···

—দেরি? কিসের দেরি?

—সূর্য ডোবার দেরি।

শুনে তুমি একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলে, পরে হেসে উঠে বলেছিলে ঃ

—তাই হবে···ভুলে গিয়েছিলাম, তোমার গ্রহ তো আমার গ্রহের মতো নয়···

বাস্তবিক। সবাই জানে, মার্কিন দেশে যখন ভর দুপুর, ফরাসি দেশে তখন সন্ধ্যা। ফ্রান্সে এক নিমেষেই পৌঁছতে পারলে, দেখা যেত সূর্যাস্তের পালা। দুর্ভাগ্যক্রমে ফরাসি দেশ যে বহু দূর!···রাজকুমারের গ্রহে কিন্তু ইচ্ছামতো-ই সূর্যাস্ত মেলে—শুধু বসবার টুলটাকে তিন-চার হাত এগিয়ে-পিছিয়ে নেওয়া দরকার। ছোট কুমার ওর ইচ্ছেমতো-ই ঘটাত সন্ধ্যা।

—একদিন, জানো, সূর্যকে আমি ডুবতে দেখেছিলাম তেতাল্লিশবার···

তারপর একটু থেমে ঃ

—জানো, মন যখন বিষণ্ণ, সূর্যের অস্ত-যাওয়া দেখতে বড়-ই ভালো লাগে।

—ওই তেতাল্লিশ-সূর্যাস্তের দিনে, বুঝি, এত বিষাদ ছিল মনে ?

ছোট রাজকুমার কোনো উত্তর দিল না।

সাত

পঞ্চম দিনের দিন—এবারও ভেড়া-ই উপলক্ষ্য ছিল—রাজকুমারের আরেক জীবনরহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। হঠাৎ, বিনা ভূমিকায়, ধ্যানমগ্ন রোমন্থনের দীর্ঘ মৌন ভেঙ্গে সে বলল ঃ

—ভেড়া যদি গাছড়া খায়···খাবে না ফুল ?

—খাবে বৈ কি···খুব খাবে ; দেখবে যা, তা-ই খাবে।

—যাদের কাঁটা আছে, তাদেরও ?

—যাদের কাঁটা আছে, তাদেরও।

—কাঁটার তবে কি প্রয়োজন ?

জানতাম না। আমি তখন মোটরের এক শক্ত-আঁটা বল্টু খোলার আপ্রাণ চেষ্টায় মহাব্যস্ত। ভাবনা ছিল খুব ঃ বুঝতে পেরেছিলাম, বিগড়ে-যাওয়া মোটরটাকে সারাতে প্রচুর সময় লাগবে—আর এদিকে তো পানীয় জল ফুরিয়ে আসছে।

—কাঁটায় লাভ কি ?···ছোট কুমার একবার একটা প্রশ্ন ক'রে ফেললে ছাড়ার পাত্র সে নয়।

বল্টু নিয়ে আমি তখন নাজেহাল। তাই না ভেবেই বললাম :

—কাঁটার কোনো কাজই নেই···ফুলের বিশুদ্ধ নিষ্ঠুরতার প্রকাশ।

—বলো কি ?···

তারপর, একটু চুপ ক'রে থেকে, অভিমান-ভরা কণ্ঠে সে বলল :

—বাজে কথা যত সব। আসল কথা কি, জানো ? ফুলেরা দুর্বল, নির্বোধ···। নিজেদের আশ্বস্ত করতে চায়··· তাই ভেবেছে, কাঁটা থাকলেই ওরা থাকবে নিরাপদে।

কোনো উত্তর দিলাম না। মনে মনে ভাবছিলাম, বল্টুটা না খুলতে চাইলে, হাতুড়ি মেরে ভাঙব। ছোট কুমার কিন্তু আমার চিন্তাধারার খেই হারিয়ে দিয়ে বলল :

—তাহলে তুমি কি সত্যি সত্যি ভাবছ, ফুলের কাঁটা···

—ভাবছি আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু···আমি, জানো, জরুরি কাজে ব্যস্ত···

—জরুরি কাজ···আমার দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে সে বলল।

আমার হাতে তখন হাতুড়ি, আঙ্গুলে তেল-কালি ; প্লেনের (ওর দৃষ্টিতে) উৎকট মোটরের উপর ঝুঁকে আমাকে কাজ করতে দেখতে লাগল সে ঃ

—বয়স্কদের মতো কথা বলছ !

লজ্জিত বোধ করলাম। ও কিন্তু নিষ্ঠুরভাবে ব'লে চলল ঃ

—কথা বলছ ওলট-পালট, সব-কিছু গুলিয়ে····

সত্যি সত্যি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কুমার ; বাতাসে ঝাঁকাচ্ছিল ওর সোনালি চুলের রাশি।

—একটা গ্রহ জানি, এক লালমুখো ভদ্রলোকের দেশ। লোকটি জীবনেও শোঁকে নি কোনো ফুল, দেখে নি কোনো তারা, ভালোবাসে নি কখনো কাউকে। যোগবিয়োগ-ই ওর একমাত্র কাজ। আর সারাদিন, তোমার মতো, সে ব'লে থাকে ঃ "আমি জরুরি কাজে ব্যস্ত, আমি ব্যস্ত জরুরি কাজে···" ব'লেই গুমোরে একেবারে গুমরে ওঠে মনে মনে। কিন্তু ও আবার মানুষ না কি ঘেঁচু ?

—কি বললে ?

—ঘেঁচু।

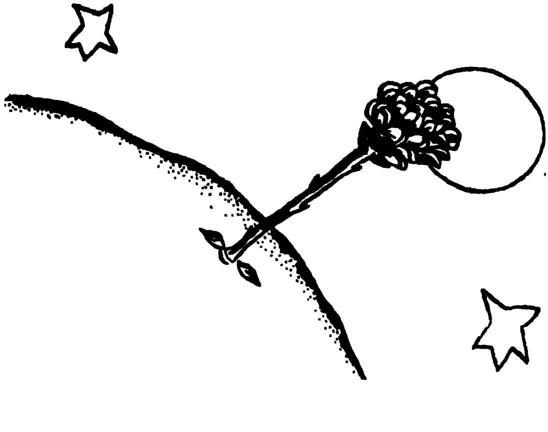
ছোট কুমার এবার রেগে টং।

—কোটি কোটি বছর ফুল তৈরি করেছে কাঁটা। কোটি কোটি বছর ভেড়া খেয়েছে ফুল। আর তুমি নাকি বলবে,

কোনো-কাজে-না-লাগা কাঁটার এত কষ্ট ক'রে তৈরি করার কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা জরুরি নয়?···ফুল-ভেড়ার সংগ্রাম জরুরি নয়?···ওই নাদুস নুদুস লালমুখো ভদ্রলোকটির যোগবিয়োগের চেয়ে জরুরি নয়? বলো, আমি যদি এক ফুল-কে চিনি যে অনন্য, আমার গ্রহে ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যার কোনো জোড়া-ই নেই—আর যদি একরত্তি এক পুঁচকে ভেড়া একদিন এমনি হঠাৎ না বুঝে-সুঝেই ফুলটিকে একগ্রাসে নাশ করে, ওটা বুঝি জরুরি নয়?

তারপর একটু যেন লজ্জা পেয়ে সে বলল:

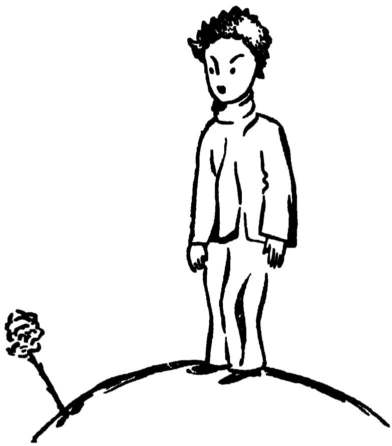
—কেউ যদি এমন এক ফুল-কে ভালোবাসে, কোটি কোটি



নক্ষত্রে যে জুড়িহীন, তবে আকাশমণ্ডলের দিকে তাকিয়েই তার মন সুখে ভ'রে ওঠে। মনে মনে সে ভাবে: "এই কোটি কোটি তারার মধ্যেই আমার ফুল আছে কোথাও···" কিন্তু, ভেড়াটা এসে যদি ফুলটিকে খেয়ে ফেলে, আকাশের তারা-রা তখন নিভে যায় এক নিমেষে। ওটা বুঝি জরুরি নয়?

আর বলতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। রাত নেমে এসেছিল।

কোথায় তখন হাতুড়ি আর বল্টু, কোথায় তৃষ্ণা, কোথায়ই বা মৃত্যুচিন্তা?···একটি তারায়, একটি গ্রহে, আমারই গ্রহে, আমাদের এই ধরণীতে, এক ছোট রাজকুমার ছিল—শোকে ভারাতুর···। যন্ত্রপাতি ছুঁড়ে ফেলে ওকে জড়িয়ে ধরলাম বাহুর বেষ্টনে, কনুইয়ে আঁকড়িয়ে; ঘুম পাড়ালাম। বললাম, "যে ফুলটিকে তুমি ভালোবাস, ওর কোনো ভয় নেই। ভেড়ার জন্য এঁকে দেব এক জালতি, ফুলের জন্য আঁকব এক বর্ম। আমি···আমি···" শব্দ খুঁজছিলাম, পাচ্ছিলাম না। বড্ড আনাড়ি লাগছিল নিজেকে। ভাবছিলাম, ওর কি ক'রে নাগাল পাই—রহস্যময় সেই অশ্রুদেশে।



আট

ঐ ফুলটাকে অবিলম্বে চিনতে শিখলাম। রাজকুমারের গ্রহে প্রথম থেকেই ফুল ছিল, সাদাসিধে ফুল, সামান্য কয়েকটি পাপড়ির সাধারণ ফুল। এক কোণে প'ড়ে থাকত, কাউকে বিরক্ত করত না। দেখা দিত ঘাসে-ঘাসে প্রভাতে, মিলিয়ে যেত সন্ধ্যায়। ওটার কথা কিন্তু আলাদা। একদিন, কি জানি কোত্থেকে উড়ে-আসা এক বীজ কুমারের গ্রহটিতে

অঙ্কুরিত হয়েছিল। অন্যান্য অঙ্কুরের সঙ্গে কোনো কিছুতেই ওর মিল ছিল না। ছোট কুমার ওকে সতর্ক নজরে রেখেছিল। কি জানি, নতুন এক ধরনের অশ্বত্থও হতে পারে! গাছটার বাড় কিন্তু থামল, শিগ্‌গিরই শুরু হল ফুল-বোনা। এক বিরাট কুঁড়ির প্রস্তুতি দেখে ছোট কুমার ব'সে থাকল এক দিব্য আবির্ভাবের অপেক্ষায়। কিন্তু, সবুজ বাসর-ঘরের আড়ালে ফুলের প্রসাধনের শেষ ছিল না। সযত্নে সে লাগাচ্ছিল রঙবেরঙ, ধীরে ধীরে সাজছিল, একের পর এক সাজাচ্ছিল পাপড়ি। রাস্তায় মাড়ানো ফুলের মতো বেরুতে চায় না সে; বেরুবে পূর্ণপ্রস্ফুটিত সৌন্দর্যে। ফুলটি সত্যি সত্যি বড় সৌখিন। কতদিন লেগেছিল তার সাজসজ্জায়! তারপর এক প্রভাতে, ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গেই আবির্ভূত হয়েছিল সে।

এত যত্ন ক'রে সে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল, আর তবু এখন হাই তুলে সে বলল্‌ঃ

—আঃ···ঘুম থেকে এই উঠেছি মাত্র; চুল আঁচড়ানোর সময় হয় নি···মাপ করুন···

ছোট কুমারের যেন চক্ষুস্থির; নিজেকে সামলাতে না পেরে সে ব'লে উঠল:

—আপনি কত সুন্দর!

ফুলটি সহজ সরলভাবে বলল :

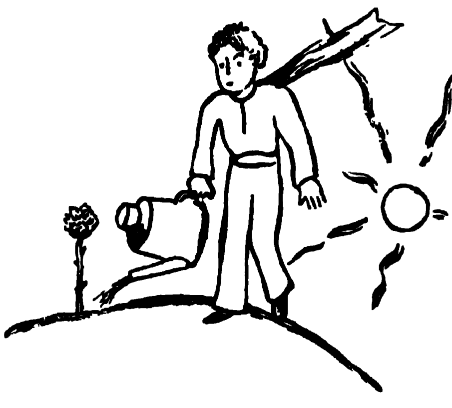
—তা-ই না ?···সূর্যোদয়ের সঙ্গেই আমার জন্ম।

ছোট কুমার তখন থেকেই বুঝল, ফুলটা বড় একটা বিনয়ী নয় ; তবে কত মর্মস্পর্শী ওর কণ্ঠস্বর।

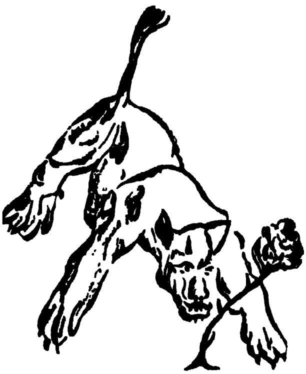
—প্রাতরাশের সময় না এটা ? দয়া ক'রে আপনি যদি···

ছোট কুমার একটু অপ্রস্তুত হয়ে টাটকা জলের ঝাঁঝরি নিয়ে ফুলটির পরিচর্যায় নেমেছিল।

এমনিভাবে রাজকুমারকে জ্বালাতন করতে শুরু করেছিল ফুলটির অহঙ্কারী অভিমান। একদিন, ওর চারটে কাঁটা দেখিয়ে, ছোট রাজকুমারকে সে বলেছিল :



—দেখেছেন আমার কাঁটা?···বাঘের থাবাও ওদের সঙ্গে পারবে না।



—আমার গ্রহে কিন্তু বাঘই নেই, ছোট কুমার আপত্তি জানিয়েছিল। আর তা ছাড়া বাঘে ঘাস খায় না···

—কিন্তু আমিও যে ঘাস নই···ফুলটি মৃদু স্বরে উত্তর দিয়েছিল।

—মাপ করুন···

—হ্যাঁ, বাঘকে ভয় করি না বটে; তবে কথা হচ্ছে কি, জানেন, বাতাসের ঝাপটা আমার অসহ্য···। একটা ছাউনি টাঙ্গিয়ে দিতে পারেন?



"বাতাসের ঝাপটা ওর সহ্য হয় না·· গাছের পক্ষে সেটা কিন্তু দুর্ভাগ্য বলতে হবে, ছোট কুমার মনে মনে বলেছিল। "ফুলটা বড় খুনসুটে···"

—আর রাতে, জানেন, আমাকে রাখবেন এক কাচের ঢাকনির নিচে। আপনার এখানে বড্ড শীত। কোনো ভালো ব্যবস্থা-ই নেই! আমি যেখান থেকে আসছি···

ফুলটি হঠাৎ থেমেছিল। ও তো বীজরূপেই এসেছিল। অন্য জগতের খবর রাখা ওর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই, ওর সেই জিভের ডগায় এসে-পড়া খাপছাড়া মিথ্যা কথাটাকে চেপে দেওয়ার জন্য, ছোট রাজকুমারকে লজ্জা দেবে ব'লে, দু-তিন বার সে কেশে উঠল :

—ছাউনিটা ?

—আনতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি যে কথা বলছিলেন।

ফুলটি আবার কেশেছিল, রাজকুমারকে অপ্রতিভ করবে ব'লে।

এমনিভাবে ছোট কুমার, পরিচর্যায় ও ভালোবাসায় ত্রুটি না রেখেও, ফুলটিতে শীঘ্রই বিশ্বাস হারিয়েছিল। ওর হঠাৎ-বলা কথাগুলিকে অযথা মূল্য দেওয়াতে সে বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল খুব।

"ওর কথায় কেনই বা কান দিয়েছিলাম আমি ?··· কুমার একদিন আমায় বলল। জানো, ফুলের কথা শুনতে নেই। ফুল শুধুই দৃষ্টি আর আঘ্রাণের বস্তু। আমার ফুলটি



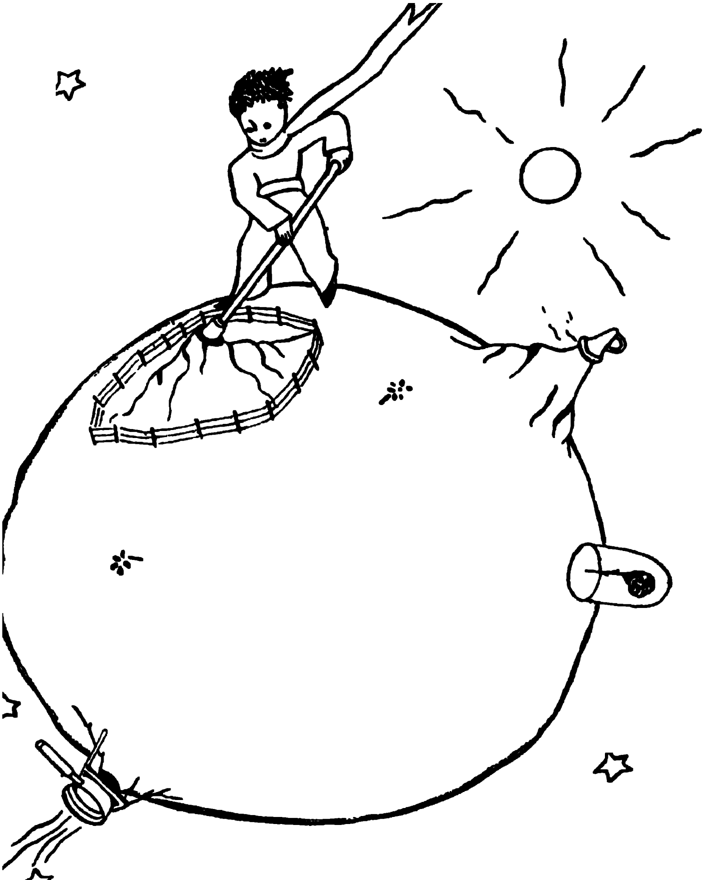
গ্রহের মধ্যে ছড়িয়ে দিত সুগন্ধ। তাতেই আমার আনন্দ পাওয়া উচিত ছিল। ওর চারটি কাঁটার বড়াইয়ের কথা আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল···আমার অন্তরে তখন মায়া জাগায় নি কেন?"

সে আবার বলল:

"বুঝতে পারি নি তখন, ওকে কথায় নয়, কাজেই বিচার করা উচিত ছিল। আমাকে ও দিত দ্যুতি, দিত ঘ্রাণ। ওকে ছেড়ে পালিয়েছি কেন? ওর ছেলেমানুষের মতো চতুরালির পিছনে যে লুকানো ছিল ওর প্রেম, আগে তা বুঝি নি কেন?···ফুলের স্বভাব বড়ই দুর্বোধ্য···। আর আমার তো তখন ভালোবাসা বোঝার বয়সও ছিল না।"

নয়

মনে হয়, ছোট কুমার গ্রহ ছেড়ে পালিয়েছিল দেশান্তরগামী বন্য পাখির ঝাঁকের সঙ্গ নিয়ে। বিদায়ের প্রভাতে তার গ্রহটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিল সে। তারপর তার দুটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরিকে যত্ন ক'রে ঝেড়ে পুঁছে সাফ করল। হ্যাঁ, তার দুটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ছিল বটে। প্রাতরাশ প্রস্তুত করতে সুবিধে ছিল খুব। ওর আরো একটি আগ্নেয়গিরি ছিল অবশ্য, সে কিন্তু নিভে-যাওয়া। তবে, ছোট রাজকুমার বলত, "কি জানি, বলা তো যায় না!..." কাজেই সেটারও পরিচর্যা করতে সে ভুলল না। আগ্নেয়গিরি, ঠিক মতন পরিষ্কৃত হলে, আস্তে আস্তে জ্বলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে, বিনা কোনো অগ্ন্যুৎপাতে। অগ্ন্যুৎপাত হল বাড়ির চিমনিতে আগুন ধরার মতো: চিমনি পরিষ্কার থাকলেই চিমনিতে আগুন ধরার কথা নয়। কিন্তু হায়, আমরা তো চিমনির কালিঝুলি ঝাড়তে পারি, আগ্নেয়গিরির বেলায় তা পারি কৈ? আগ্নেয়গিরি সাফ করতে না পারাতেই আগ্নেয়গিরির এত উৎপাত।



ছোট কুমার উপড়িয়ে দিল কয়েটা অশ্বত্থ-চারা, বিষণ্ণ মনে। সে তো আর ফিরবে না ব'লেই স্থির করেছিল। তবে কি ভালো-ই না লাগছিল তার এই প্রাত্যহিক কর্ম-সমাধা। ঝাঁঝরি-ভরা জল নিয়ে ফুলটির কাছে সে হাজির হল। হঠাৎ, কাচের ঢাকনিতে তাকে ঢাকতে গিয়ে সে বুঝল, ওর চোখে জল আসছে।

—তাহলে আমি আসি, ফুলটিকে সে বলল।

ফুলটি কিন্তু নিরুত্তর।

—আমি চললাম, ছোট কুমার আবার বলল।

ফুল কাশল। শীতে নয়···তবু কাশল। তারপর বলল :

—আমি মূর্খ ছিলাম। আমার মূর্খতার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। সুখী হতে চেষ্টা কর।

ছোট কুমার আশ্চর্য হল : ফুলটির কণ্ঠস্বরের মধ্যে অভিযোগের আভাসই ছিল না। সে দাঁড়িয়ে রইল, স্তব্ধের মতো, ঢাকনি হাতে, ফুলের এই অভিনব মাধুর্যের রহস্য বুঝতে না পেরে।

—তোমাকে ভালোবেসেছি, ফুলটি বলল ; সেই প্রথম থেকেই বেসেছি। তুমি জানতে পার নি···আমারই দোষে। আর তুমিও তো মূর্খ ছিলে কম নয়। কিন্তু যাক···সুখী হতে চেষ্টা কর। আর ওই ঢাকনি-ও থাক···লাগবে না কোনো কাজে।

—কিন্তু বাতাস ?

—আমার এমন কিছু সর্দি হয় নি। আর জানো, রাতের খোলা হাওয়া ফুলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

—কিন্তু জন্তু···

—শুঁয়োপোকা সহ্য করে না যে, কেমন ক'রেই বা পাবে প্রজাপতির সঙ্গ? প্রজাপতি না কি অদ্ভুত সুন্দর! আর ওরা না থাকলে, কে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে? তুমি তো দূরে থাকবে···। আর বড় বড় জানোয়ারদের, জানো, আমি ভয় করি না একটুও—আমারও যে নখ আছে···

ব'লে ফুলটি, নির্বোধ সরল শিশুর মতো, বাড়িয়ে দেখাল তার চারটি কচি কাঁটা। তারপর সে বলল :

—আর দেরি ক'রে কি লাভ?···বিরক্তি লাগে। যাবে ব'লে স্থির করেছ, তবে এসো।

ওর পাপড়ি ভ'রে জল চুঁইয়ে পড়ছিল···ওর অশ্রু ধরা পড়ার ভয়েই এই তাগাদা তার। এমনি অহঙ্কারী ফুল ছিল সে।

দশ

ছোট রাজকুমার নেমে এল ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯ ও ৬৩০ নম্বর গ্রহের এলাকায়। স্থির করল, ওগুলো সে ঘুরে দেখে আসবে। সময়ও কাটানো যাবে, শিক্ষালাভেরও আশা আছে।

প্রথম গ্রহে ছিল এক বৃদ্ধ রাজার অধিবাস। ব'সে আছেন রাজা, রাজকীয় জমকালো পরিচ্ছদে, এক আড়ম্বরহীন—আর তবু মহামহিম—সিংহাসনে।

—আঃ এসেছে এক প্রজা, রাজকুমারকে লক্ষ্য ক'রেই রাজা ব'লে উঠলেন।

ছোট রাজকুমার ভাবল :

—আমাকে দেখে নি তো কোনো জন্মে, ও আবার আমাকে চিনবে কোত্থেকে ?

জানত না সে, রাজাদের কাছে জগৎ-সংসারের হিসেবটা সরল : মানুষমাত্রেই প্রজা।

—একটু এগিয়ে এসো তো, তোমাকে ভালো ক'রে দেখি, বললেন রাজা, এই প্রথম প্রজার প্রাপ্তিতে গর্বিত বোধ ক'রে।

ছোট রাজকুমার বসার জায়গা খুঁজল, পেল না···সারা গ্রহটিই রাজার সেই জমকালো পরিচ্ছদে মোড়া! তাই দাঁড়িয়ে থাকল কুমার, আর, ক্লান্ত ছিল ব'লে, হাই তুলল।

—রাজার সামনে হাই তোলা শিষ্টাচার-পরিপন্থী, রাজা বললেন। তোমাকে হাই তুলতে মানা ক'রে দিলাম।

—মাফ করুন, একটু লজ্জিত হয়ে ছোট রাজকুমার বলল; নিজেকে সামলাতে পারি নি। অনেক পথ এসেছি কিনা, ঘুমোনোর সুযোগ পাই নি।

—তাহলে, রাজা বললেন, তোমাকে হাই তোলার আদেশ দিচ্ছি। অনেক বছর কাউকে হাই তুলতে দেখিও নি। হাই তুলতে দেখে কৌতূহল লাগে। হাই তোলো বলছি, হাই তোলো।

—আর পারছি না, লজ্জা করছে এবার, কুমার বলল, অপ্রতিভ হয়ে।

তাহলে···তাহলে···আমার হুকুম এই যে তুমি মাঝে মাঝে হাই তুলবে, আর মাঝে মাঝে···মাঝে মাঝে···

কথা খুঁজে না পেয়ে একটু যেন বিরক্ত হলেন রাজা।

রাজা তো আধিপত্য-বোধের আতিশয্যে কোনো প্রকার

অবাধ্যতা সহ্য করতেন না। একচ্ছত্র সম্রাট তিনি। তবে কিনা অতীব দয়ালু, তাই তাঁর আদেশমাত্রই ছিল ন্যায়সঙ্গত।

—ধরা যাক, তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি এক সেনাপতিকে আদেশ দিয়েছি এক গাঙচিলে পরিণত হতে; সে যদি না মানে, তবে ওর দোষ নয়, দোষ আমারই।

—বসতে পারি কি? নম্রভাবে বলল রাজকুমার।

—আমার আদেশ এই যে তুমি এখনি ব'সে পড়···ব'লে রাজা মহামহিম ভঙ্গিতে ওর জমকালো পরিচ্ছদ সরিয়ে নিলেন।

ছোট রাজকুমারের আশ্চর্যের শেষ ছিল না। গ্রহটি তো ছোট্ট খুব; তবে রাজা রাজত্ব করেন কার উপর?

—মহারাজ, অনুমতি দিন, একটা কথা জিগ্যেস করব।

—অনুমতি নয়, আদেশ! রাজা তখনি সংশোধন ক'রে উত্তর দিলেন।

—মহারাজ···আপনি রাজত্ব করেন কার উপর?

—সব কিছুর উপর, রাজা বললেন উদাত্ত সরলতার সঙ্গে।

—সব কিছুর উপর?

রাজা বিনীত ভঙ্গিতে দেখালেন নিজের গ্রহ, অন্যান্য গ্রহসমূহ আর নক্ষত্রমণ্ডল।

—ওই সমস্তর উপর? ছোট রাজকুমার প্রশ্ন করল।

—ওই সমস্তর উপর, রাজা উত্তর দিলেন।

রাজা শুধু যে একচ্ছত্র সম্রাট তা-ই নয়, সার্বভৌম মহীপালও বটে।

—তারাগুলো আপনার কথা মানে ?

—মানে বৈ কি, আদেশ পাওয়ামাত্রই মানে! কোনো প্রকার অশৃঙ্খলাকে আমি আদৌ আমলই দিই না।

এমন প্রভুত্বের কথা শুনে ছোট রাজকুমার তো থ। এত ক্ষমতা-প্রাপ্ত হলে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ও শুধু তেতাল্লিশ বার কেন, বাহাত্তর, একশো, এমন কি দুশো বার পর্যন্ত সূর্যকে ডুবতে দেখতে পারত, চেয়ারটাকে একটুও না এগিয়ে-পিছিয়ে।

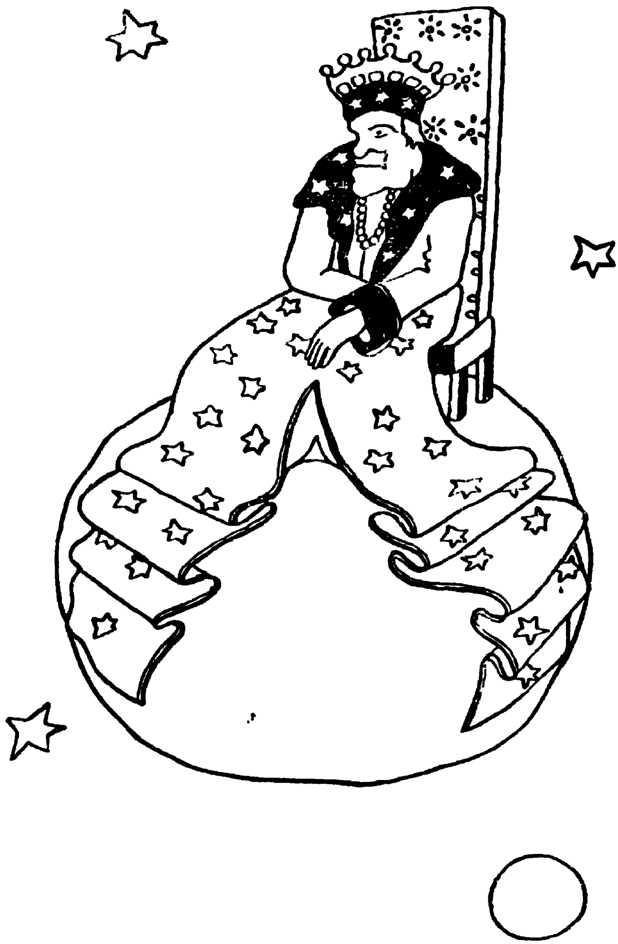
ওর ছেড়ে-আসা গ্রহের স্মরণে কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে, ছোট রাজকুমার সাহস ক'রে রাজার কাছ থেকে এক বর চাইল ঃ

—সূর্যাস্ত দেখতে ইচ্ছে করছে খুব···অনুগ্রহ ক'রে সূর্যকে অস্ত যেতে আদেশ দিন না!

—আমি যদি এক সেনাপতিকে আদেশ দিই এক ফুল থেকে আরেক ফুলে উড়ে যেতে প্রজাপতির মতো, ওকে যদি বলি একটা নাটক লিখে দিতে কিংবা বলি, এক গাঙচিলে পরিণত হও · ও যদি সেই হুকুম তামিল না করে, তবে কার দোষ—ওর না আমার ?

—আপনারই দোষ, ছোট কুমার বলল দৃঢ়কণ্ঠে।

—ঠিক। যে যা দিতে পারে, তার কাছে তার বেশি



চাওয়া অন্যায়। আর ন্যায়-ই তো প্রভুত্বের ভিত্তিপ্রস্তর। তোমার প্রজাদের তুমি যদি আদেশ দাও সমুদ্রে লাফ দিতে, তবে ওরা বিপ্লব করবেই। বাধ্যতা দাবি করার অধিকার আমার আছে, কেননা আমার যাবতীয় আদেশ ন্যায়সঙ্গত।

—তাহলে আমার সূর্যাস্ত ?···ছোট কুমার একবার একটা প্রশ্ন ক'রে ফেললে ছাড়ার পাত্র সে নয়।

—পাবে বৈ কি! আমি আদেশ দেওয়ামাত্রই পাবে। আদেশ দেব রাষ্ট্রবিজ্ঞানসম্মত সময়ে, অনুকূল পরিস্থিতিতে।

—অর্থাৎ ?

রাজা দু তিন বার গলা খাঁকারি দিয়ে দীর্ঘাকার উৎকট এক পঞ্জিকার পাতা উল্টিয়ে বললেন ঃ

—হুকুম দেব সন্ধে সাতটা চল্লিশ নাগাদ। দেখবে, সূর্য আমার আদেশ মানবে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে।

ছোট কুমার হাই তুলল। রাজার গ্রহে ওর আর ভালো লাগছিল না। ওর মন-কেমন করছিল নিজের সূর্যাস্তের কথা ভেবে।

—আমার আর কোনো কাজ নেই আপনার এখানে। আমি চললাম।

রাজা কিন্তু ওর এই একমাত্র প্রজাকে হারিয়ে ফেলতে প্রস্তুত ছিলেন না।

—যেয়ো না, তিনি বললেন। তোমাকে মন্ত্রী করলাম।

—কিসের মন্ত্রী ?

—কিসের ?···ইয়ে···আইন-মন্ত্রী।

—কিন্তু কার বিচার করব, বলুন ? আপনার গ্রহে তো কেউ-ই নেই !

—বলা যায় না, রাজা বললেন। আমি তো এখনও গ্রহের চারিদিকে ঘুরে আসি নি। আমার বয়স হয়েছে কম নয়···আমার গ্রহে গাড়ি রাখার মতো জায়গা নেই···আর, আমার এই বেতো পা দুটো আর যেন চলতেই চায় না।

—কিন্তু আমি এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি, ঝুঁকে প'ড়ে গ্রহটির অন্য পিঠ আর একবার দেখে নিয়ে ছোট রাজকুমার বলল। ওদিকটাও জনমানবহীন।

—তাহলে বিচার করবে নিজেরই, রাজা বললেন। ওটা-ই সব চেয়ে কঠিন বিচার। অন্যকে বিচার করার চেয়ে নিজেকে বিচার করা ঢের কঠিন। নিজেকে বিচার করতে পারে যে-মানুষ, সে-ই সত্যিকার জ্ঞানী।

—আত্মবিচার, ছোট রাজকুমার বলল, যে-কোনো স্থানেই করতে পারি ; আমার এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।

—তবে শোনো, রাজা বললেন ; আমার যেন মনে হয়,

আমার গ্রহের কোথাও এক বুড়ো ধেড়ে ইঁদুর আছে। একেক রাতে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করে। ঐ বুড়ো ধেড়ে ইঁদুরটাকেই তুমি বিচার করবে। মধ্যে মধ্যে ওকে দেবে প্রাণদণ্ডাদেশ। ওর জীবন-মৃত্যু থাকবে তোমারই হাতে। তবে শেষ পর্যন্ত দণ্ডটা অবশ্যই স্থগিত রাখবে, আমি ছাড়া ও আমার গ্রহের একটি মাত্র জীব।

—আমি কিন্তু, ছোট রাজকুমার বলল, কাউকে প্রাণদণ্ডটণ্ড দিতে ভালোবাসি না। তাই ভাবছি, এবার তাহলে আসি···।

—যেয়ো না, রাজা বললেন।

ছোট কুমার যেতে উদ্যত হয়েও বৃদ্ধ রাজাকে দুঃখ দিতে চাইল না :

—মহারাজ অনুগ্রহ ক'রে যদি আমাকে ন্যায়সঙ্গত এক আদেশ দেন···ধরুন, আমাকে যদি বলেন এক মিনিটের মধ্যেই রওনা হতে···। পরিস্থিতি, মনে হচ্ছে, অনুকূলে।

রাজা নিরুত্তর থাকায়, ছোট রাজকুমার একটু ইতস্তত করল, তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিদায় নিল।

—যাও, রাজা সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলেন; তোমাকে রাজদূত ক'রে দিলাম।

ভারি রাজকীয় সেই কর্তৃত্বের ভঙ্গিটি তাঁর।

যেতে যেতে ছোট কুমার ভাবল, বয়স্কেরা কি অদ্ভুত!

এগারো

—আ, এক স্তুতিকার!··· ছোট কুমারকে আসতে দেখেই ব'লে উঠল দ্বিতীয় গ্রহের অধিবাসী আত্মাভিমানী লোকটি।



আত্মাভিমানীদের কাছে মানুষমাত্রই স্তুতিকার।

—নমস্কার, ছোট রাজকুমার বলল। আপনার টুপিটা কিন্তু ভারি মজার।

—শুধু মজার নয়, কাজের। সাধুবাদ পেলে টুপিটা খুলে কৃতজ্ঞতার অভিনন্দন জানাই। দুর্ভাগ্যবশত এদিক দিয়ে কেউ বড় একটা আসে না।

—তা-ই নাকি? লোকটির কথা না বুঝেও ছোট রাজকুমার বলল।

—হাততালি দাও তো, দেখি···

ছোট রাজকুমার হাততালি দিতে লাগল। আত্মাভিমানী লোকটি টুপি খুলে সবিনয়ে নমস্কার জানাল।

তামাসা তো বেশ, ছোট রাজকুমার মনে মনে বলল; রাজার ওখানে এতটা মজা পাই নি। ব'লে সে হাততালি দিল ফের; আত্মাভিমানী লোকটিও আবার টুপি খুলল।

পাঁচ-সাত মিনিট কাটল এমনিধারা কসরতে। তারপর:

—হাততালি দেওয়া বড় একঘেয়ে লাগছে, ছোট রাজকুমার বলল। টুপিটা যাতে প'ড়ে যায়, তার জন্য কি করতে হয়, বলুন তো?

আত্মাভিমানী লোকটি কিন্তু কানেই তুলল না কথাটা। আত্মাভিমানীরা শুধু প্রশংসাবাদ শুনতেই উৎকর্ণ।

—তুমি কি আমাকে সত্যি সত্যি প্রশংসা কর খুব? ছোট রাজকুমারকে সে প্রশ্ন করল।

—'প্রশংসা' মানে?

—মানে, স্বীকার করা যে, আমিই এই গ্রহের স্বরূপতম, সুবেশতম, ধনবত্তম, জ্ঞানবত্তম ব্যক্তি।

—কিন্তু এ-গ্রহে তো আপনি ছাড়া আর কেউ নেই!

—তবুও আমাকে এই আনন্দ দাও। আমার প্রশংসা কর।

—আপনার প্রশংসা করি, ছোট কুমার বলল কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে। কিন্তু তাতে আপনার কি আসে যায়?

ছোট রাজকুমার বিদায় নিল।

যেতে যেতে সে ভাবল, বয়স্কেরা সত্যিই বড় অদ্ভুত!



বারো

পরের গ্রহটিতে বাস করত এক মাতাল। সেখানে ছোট কুমার বেশিক্ষণ থাকল না, মন-মরা হয়ে পড়ল।

মাতালটা ব'সে ছিল চুপচাপ। ওর সামনে সারি সারি খালি আর সারি সারি ভর্তি মদের শিশি।

—ওখানে ব'সে কি করছ? প্রশ্ন করল ছোট কুমার।

—মদ খাচ্ছি, মাতাল বলল নিরানন্দ স্বরে।

—খাও কেন, বলো তো?

—ভুলে যাওয়ার জন্য।

—কি ভুলতে চাও? ছোট কুমার বলল সহানুভূতির সঙ্গে।

—আমার লজ্জা-ই ভুলতে চাই, মাথা নত ক'রে স্বীকার করল মাতাল।

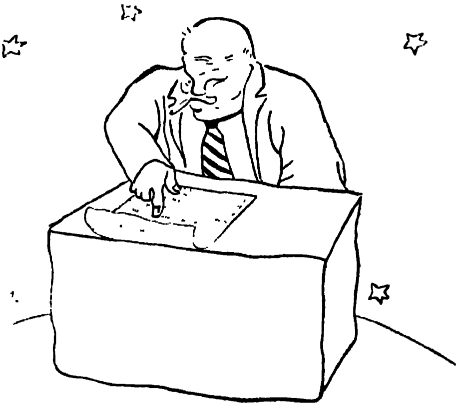
—কিসের লজ্জা? ছোট কুমার বলল, উপচিকীর্ষায় প্রণোদিত হয়ে।

—এই মদ-খাওয়ারই লজ্জা···।

মাতাল আর কিছুই বলল না।

ছোট কুমার বিদায় নিল। ওর হেঁয়ালি লাগছিল খুব।

যেতে যেতে সে ভাবল, বয়স্কেরা যৎপরোনাস্তি অদ্ভুত।



তেরো

চতুর্থ গ্রহ ছিল এক ব্যবসায়ীর। লোকটি এত ব্যস্ত যে মাথাটা পর্যন্ত তুলল না রাজকুমারের আবির্ভাবে।

—নমস্কার, বলল কুমার। আপনার চুরুটটা নিভে গেছে।

—তিন আর দুয়ে পাঁচ। পাঁচ আর সাতে বারো। বারো আর তিনে পনেরো। নমস্কার। পনেরো আর সাতে বাইশ। বাইশ আর চারে ছাব্বিশ। ধরিয়ে নেওয়ার সময় নেই। ছাব্বিশ আর পাঁচে একত্রিশ। উফ্…যোগফল তাহলে দাঁড়াল পঞ্চাশ কোটি ষোল লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো একত্রিশ।

—কিসের পঞ্চাশ কোটি?

—এ কি? যাও নি এখনও তুমি? পঞ্চাশ কোটি···ইয়ে··· মানে···ভুলে গেছি। এত কাজের চাপ! আর আমার কাজ তো ছেলেখেলা নয়, একেবারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দুই আর পাঁচে···

—কিসের দুই? কিসের পাঁচ? আর পঞ্চাশ কোটিই বা কিসের? একবার একটা প্রশ্ন ক'রে ফেললে ছাড়ার পাত্র ছোট কুমার নয়।

ব্যবসায়ী এবার মুখ তুলল:

—এই গ্রহে আমি বাস করেছি পুরো চুয়ান্ন বছর; এতদিনে কাজে ব্যাহত হয়েছি মাত্র তিনবার। একবার, বাইশ বছর আগে, কি-জানি-কোত্থেকে-এসে-পড়া এক ঝিঁঝির উৎকট ডাকে। আমার যোগ-বিয়োগে সেদিন চারটি ভুল ধরা পড়েছিল। আর একদিন, এগারো বছর আগে, বাতের কামড়ে। ব্যায়ামের অভাবে। ব্যায়ামের সময় কৈ? আর তৃতীয়বার হল আজকেই!···কত বলছিলাম যেন? পঞ্চাশ কোটি···

—কিসের কোটি?

লোকটি অনন্যোপায় হয়ে হার মেনে বলে উঠল:

—এক এক সময় আকাশে দেখা যায়।

—মাছি?

—না, না···সোনালি রঙ···জ্বলছে!

—জোনাকি?

—কি সব বলছ···অলসেরা যাদের দেখে আকাশকুসুমের মালা গাঁথে···। আমি কিন্তু অলস নই, আকাশকুসুমের মালা গাঁথার আমার সময় নেই।

—ও!···নক্ষত্র?

—হ্যাঁ···নক্ষত্রই বটে, কথাটা মনে আসছিল না।

—আর সেই পঞ্চাশ কোটি নক্ষত্র নিয়ে আপনি কি করছেন?

—পঞ্চাশ কোটি নয়, পঞ্চাশ কোটি ষোল লক্ষ বাইশ হাজার সাতশো একত্রিশ। আমার যোগফল নির্ভুল।

—আর এতগুলো তারা নিয়ে আপনি কি করছেন?

—ওদের নিয়ে কি করছি?

—হ্যাঁ, ওদের নিয়ে কি করছেন?

—কিছু তো করি না। ওরা আছে আমার অধিকারে।

—এতগুলো?

—এতগুলো।

—কিন্তু আমি যে এক রাজাকে দেখেছি···

—অধিকারের কথা বলছিলাম, শাসনের কথা নয়। আমার অধিকার আর রাজাদের শাসন—এই দুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

—নক্ষত্রের অধিকারে লাভ আছে কি ?

—আছে বৈ কি। ওই অধিকারের জন্যই আমি ধনী।

—আর ধনী হয়েই বা আপনার লাভ কি ?

—অন্য তারা আবিষ্কৃত হলে, ওদেরও কিনতে পারি।

ছোট রাজকুমার ভাবল, লোকটি তর্ক করছে তৃতীয় গ্রহের মাতালটার মতো।

তবু সে প্রশ্ন করতে ছাড়ল না :

—তারা-রাই বা কেমন ক'রে আসতে পারে কারো অধিকারে ?

—ওরা কাদের ? লোকটি বলল বিরক্তিমাখা স্বরে।

—কি জানি ! কারো নয়।

—সুতরাং আমারই, কেননা আমিই প্রথম ভেবেছি ওদের অধিকারের কথা।

—তাতেই হয় ?

—বাঃ হবে না কেন ? মনে কর, জঙ্গলে পেয়েছ এক হীরে, হীরে তোমার। সমুদ্রে পেয়েছ এক দ্বীপ ; দ্বীপও তোমার। কিংবা ধর, আবিষ্কার করেছ কিছু, আবিষ্কারের সর্বস্বত্ব তোমারই রক্ষিত···। তেমনি ভাবে আমিও তারা-দের মালিক, কারণ আমার আগে কেউ-ই ভাবে নি ওদের অধিকারের কথা।

—তা ঠিক ! কিন্তু তারাগুলো নিয়ে কি করছেন ?

—ওদের পরিচালনা করি ; মানে, ওদের হিসেব-নিকেশ রাখি আর কি ! কাজটা, জানো, বড় জটিল।

ব্যাখ্যাটা কিন্তু ছোট কুমারের কাছে সন্তোষজনক ব'লে মনে হচ্ছিল না।

—মনে করুন আমার এক মাফ্‌লার্ আছে ; সেটাকে আমি ঘাড়ে-গলায় জড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। মনে করুন আমার একটি ফুল আছে ; ফুলটিকে তুলে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আপনি তারা-দের তুলতে পারেন কৈ ?

—তুলতে পারি না বটে। তবে জমা রাখতে পারি ব্যাঙ্কে।

—মানে ?

—আমার তারা-দের হিসেব এক টুকরো কাগজে লিখি, আর কাগজটা রাখি তালা-আঁটা এক দেরাজে।

—ব্যস্ ?

—ব্যস্।

ব্যাপারটা, ছোট রাজকুমার ভাবল, বেশ মজার। আর কাব্যিকও খুব। তবে বড় একটা সিরিয়স্ নয়।

সিরিয়স্ কাকে বলে, সে-বিষয়ে বয়স্কদের মতের সঙ্গে ছোট রাজকুমারের মতের মোটেই মিল ছিল না।

—আমি একটি ফুলের মালিক, সে বলল ; ওকে রোজ পরিচর্যা করি ঝাঁঝরি-ভরা জলে। আর তিনটে আগ্নেয়গিরিও

আছে আমার দখলে; প্রতি সপ্তাহে ওদের ঝাঁটিয়ে পরিষ্কার করি। হ্যাঁ, নিভে-যাওয়াটাকেও ঝাঁট দিই বটে—কি জানি, বলা তো যায় না! আমার অধিকারে থাকায় ফুল আর আগ্নেয়গিরির লাভ আছে। কিন্তু তারাগুলির আপনাকে দিয়ে কি প্রয়োজন?

ব্যবসায়ী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হাঁ ক'রে ব'সে রইল। ছোট কুমার বিদায় নিল।

যেতে যেতে সে শুধু ভাবল, বয়স্কেরা সত্যি অভাবনীয় ভাবে অদ্ভুত।

চোদ্দো

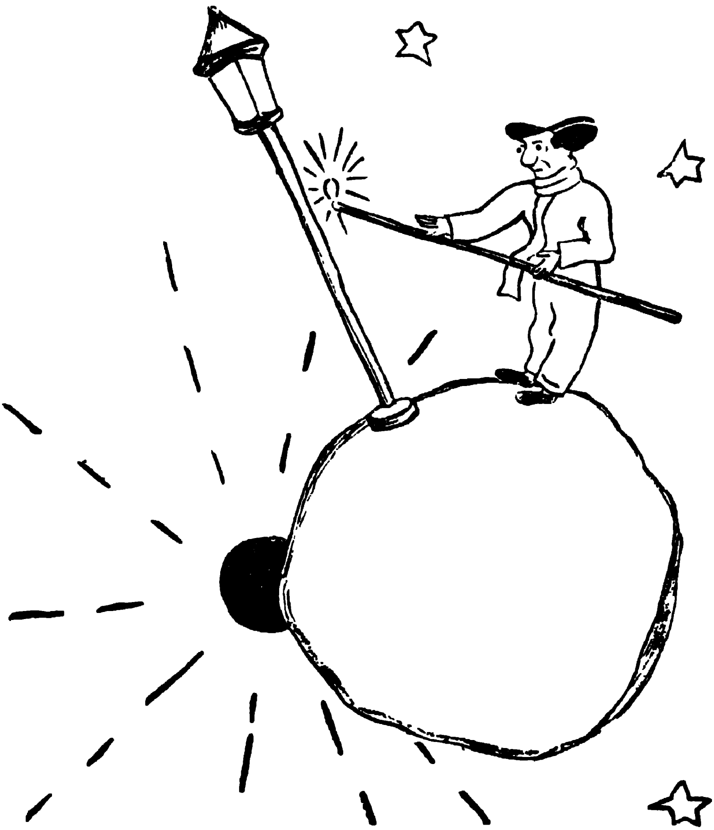
পঞ্চম গ্রহ ছিল কৌতূহলপ্রদ। গ্রহসমূহের মধ্যে সব থেকে ছোট্ট সে। তাতে শুধু ধরত এক ল্যাম্প-পোস্ট আর একটা লোক—ল্যাম্প-পোস্টের বাতি জ্বালাবার একটা লোক। নেই বাড়িঘর, নেই রাস্তাঘাট···ছোট রাজকুমার বুঝতে পারছিল না, মধ্যাকাশের এই জনমানববিহীন গ্রহে ল্যাম্প-পোস্টটির আর বাতিওয়ালার কি প্রয়োজন। মনে মনে সে বলছিল :

—বাতিওয়ালা মূঢ় বটে ; তবে রাজা, আত্মাভিমানী, মাতাল আর ব্যবসায়ীর মতো তত নয়। অর্থাৎ কিনা, ওর কাজের মানে আছে। লোকটি ল্যাম্প-পোস্টের বাতি জ্বালালেই, আকাশমণ্ডলে জন্ম নেয় এক নতুন তারা, ফুটে ওঠে এক ফুল। বাতি নিভিয়ে দিয়েই সে যেন সেই তারা-কে, সেই ফুলটিকে ঘুম পাড়ায়। কাজটা ভারি সুন্দর, আর সুন্দর ব'লেই সত্যি প্রয়োজনীয়।

গ্রহটিতে নামামাত্রই ছোট রাজকুমার অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল :

—নমস্কার ! বাতিটাকে নিভিয়ে দিচ্ছ ?

—নিয়মটা তা-ই। প্রাতঃপেন্নাম !



—কিসের নিয়ম ?

—বাতিটাকে নিভিয়ে দেওয়ার নিয়ম। শুভরাত্রি!

ব'লে লোকটি বাতিটাকে জ্বালাল ফের।

—কিন্তু জ্বালিয়ে দিলে যে ?

—নিয়মটা তা-ই।

—বুঝলাম না, ছোট রাজকুমার বলল।

—বুঝবার কিছুই নেই। নিয়মই নিয়ম। প্রাতঃপেন্নাম!

ব'লে লোকটি বাতিটাকে নিভিয়ে এক লাল-ছকওয়ালা রুমালে তার কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

—প্রলয়ঙ্কর খাটুনি, বাতিওয়ালা বলল। আগে অবশ্য কাজটা ছিল যুক্তিসঙ্গত: নেভাতাম ভোরে, জ্বালাতাম সন্ধ্যায়। বিশ্রাম করতাম অবশিষ্ট দিন, নিদ্রা যেতাম অবশিষ্ট রাত।

—আর এখন বুঝি নিয়মটা বদলেছে ?

—বদলায় নি, হায়, বদলায় নি। আর এতেই সর্বনাশ। বছরের পর বছর গ্রহটি ঘুরেছে দ্রুততর বেগে, নিয়মটা তবুও বদলায় নি।

—তবে ?

—তবে এখন এক মিনিটের মধ্যেই গ্রহটি সম্পূর্ণ ঘুরে আসে। চোখের পাতা এক করার সময়টুকু নেই। প্রত্যেক মিনিটে একবার ক'রে জ্বালাই নেভাই।

—মজা তো খুব! এখানকার দিন-রাত তাহলে এক মিনিটের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়?

—মজাটা পেলে কোথায়? এই দেখ না, কথা বলতে বলতেই আমরা কাটিয়ে দিয়েছি এক মাস।

—এক মাস?

—এক মাস। ত্রিশ মিনিট। এখানকার ত্রিশ দিন। শুভরাত্রি!

ব'লে লোকটি বাতিটাকে জ্বালাল।

ছোট রাজকুমার তাকে দেখতে লাগল। তাকে ভালোবেসে ফেলল। বাতিওয়ালার কর্তব্যবোধ তাকে মুগ্ধ করেছিল। চেয়ার এগিয়ে সূর্যাস্ত দেখার কথা তার হঠাৎ মনে পড়ল। তার নতুন বন্ধুকে সে সাহায্য করতে চাইল:

—জানো···উপায় আছে। বিশ্রাম করতে চাইবে যখন··

—চাই সব সময়, বাতিওয়ালা বলল।

কর্তব্যপরায়ণ হলে কি হবে, লোকটি আসলে আলস্য-প্রবণও ছিল কম নয়।

ছোট রাজকুমার বলল:

—তোমার গ্রহ এত ছোট্ট যে তিনবার পা ফেললেই ওকে প্রদক্ষিণ করা যায়। বিশ্রাম করতে চাইবে যখন,

আস্তে আস্তে পা চালাবে সূর্যের দিকে। যতক্ষণ হাঁটবে, ততক্ষণ ফুরোবে না দিন, নামবে না সন্ধ্যা।

—ও আবার কি রকম বিশ্রাম? বাতিওয়ালা বলল; আমার একটিমাত্র বিশ্রাম—ঘুম।

—দুর্ভাগ্য বলতে হবে, ছোট রাজকুমার বলল।

—দুর্ভাগ্য বটে, বাতিওয়ালা বলল। প্রাতঃপেন্নাম!

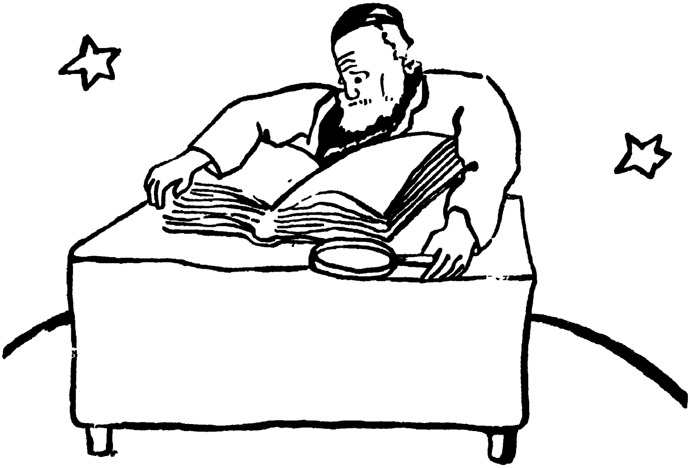
ব'লে সে বাতিটাকে নেভাল।

ছোট কুমার রওনা হল। যেতে যেতে ভাবল রাজা ও আত্মাভিমানী, মাতাল ও ব্যবসায়ীর কথা। ওরা বোধ হয় ঐ বাতিওয়ালাটার নিন্দা করত। আর তবু একমাত্র ওকে-ই আমার হাস্যকর ব'লে মনে হয় না—কাজ ক'রে যাচ্ছে সে, নিজের কথা না ভেবে।

ছোট রাজকুমার এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে মনে সে বলল:

—আর কারও সঙ্গে তো আমার বনে না; ইচ্ছে ছিল ওরই সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই। কিন্তু আর কি করি, বলো? ওর এত ছোট্ট গ্রহে দুজনের মতো জায়গা কৈ?

আসলে কিন্তু রাজকুমারের মনোদুঃখের আর একটা কারণ ছিল: ওর মন খারাপ করছিল গ্রহটির দৈনন্দিন এক হাজার চারশো চল্লিশ বার সূর্যাস্তের কথা ভেবে।



পনেরো

ষষ্ঠ গ্রহটি ওর দশগুণ বড় হবে। ওতে বাস করে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মোটা মোটা কি সব বই লিখছে।

—আরে, এই যে এক দেশাবিষ্কারক!···রাজকুমারকে আসতে দেখেই ব'লে উঠল সে।

চেয়ার ছিল না দেখে ছোট কুমার বসল বৃদ্ধটির টেবিলে। ব'সে দম নিল। কত পথই না এসেছে সে!

—কোত্থেকে আসছ? লোকটি জিগ্যেস করল।

—আপনার ওই মোটা বইটা কি?···আর আপনিই বা এখানে কি করছেন?···ছোট রাজকুমার বলল।

—আমি ভৌগোলিক।

—ভৌগোলিক মানে ?

—নদনদী - মরুমেরু - নগরনগরী - সাগরপর্বতাবস্থানজ্ঞ ইতি ভৌগোলিক উচ্যতে।

—বেশ ইন্টারেস্টিং তো। যাকে বলে চাকরির মতো চাকরি···

ব'লে ছোট কুমার একদৃষ্টিতে ভৌগোলিকের গ্রহটির পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। নাঃ ওইরকম রাজকীয় গ্রহ সে আর দেখে নি কোথাও।

—আপনার গ্রহটি, জানেন, ভারি সুন্দর। সমুদ্র আছে ?

—থাকতেও পারে; আমার জানার উপায় নেই, ভৌগোলিক বলল।

—তা-ই না কি? [ছোট কুমার একটু হতাশ হয়ে পড়ল] পর্বত ?

—জানি না।

—নগর, নদী, মরুভূমি ?

—তাও জানি না।

—জানেন না, মানে? আপনি না ভৌগোলিক ?

—ভৌগোলিক বটে, দেশাবিষ্কারক নই। দেশাবিষ্কারকের বড় অভাব; তাই আমার এত অসুবিধে! ভৌগোলিকেরা তো নগর, নদী, সমুদ্র, পর্বত কিংবা মরুভূমি চোখে দেখতে

যায় না। ঘুরে বেড়াবার ওদের সময় নেই। অফিসে ব’সেই ওরা কাজ করে। অফিসে ব’সেই দেশাবিষ্কারকদের সঙ্গে দেখা করে। ওদের হরেক রকম প্রশ্ন ক’রে ওদের জ্ঞানটুকু নোট-বইয়ে টুকে নেয়। কোনো এক দেশাবিষ্কারকের বিবৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব’লে মনে হলে, ওর নৈতিক চরিত্র বিষয়ে অনুসন্ধান ক’রে···

—বলেন কি?

—মনে কর, একজন দেশাবিষ্কারক সত্য কথা বলে নি··· মনে কর, ওর মিথ্যা কথা স্থান পেয়েছে ভূগোলের পুঁথিতে··· সর্বনাশ! আবার ধর, একজন দেশাবিষ্কারক একটু বেশি পানাসক্ত···ওরও সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।

—কেন?

—মাতালেরা একটা থাকলেও দুটো লেখে। ওদের বিশ্বাস করলে ভৌগোলিকেরাও এক পর্বতের জায়গায় লিখবে দুই।

—আমি এমন একজনকে চিনি যে বিশ্বাসযোগ্য দেশাবিষ্কারক হতে পারত না।

—তা হবে। তারপর দেশাবিষ্কারকের সচ্চরিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলে, ভৌগোলিকেরা ওর আবিষ্কারের তথ্যগুলিকে পরীক্ষা করতে বসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

—আপনারা নিজেরা ওখানে গিয়ে··· ?

—না। যাব আবার কোন্ দুঃখে ? দেশাবিষ্কারকটিকে আমরা বলি ওর আবিষ্কারের প্রমাণ দাখিল করতে। মনে কর, মস্ত বড় এক পাহাড় আবিষ্কার করেছ···ওখান থেকে মস্ত মস্ত পাথর এনে···

ভৌগোলিক হঠাৎ থেমে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠল :

—কিন্তু তুমিও তো অনেক দূর থেকে আসছ। তুমিও একজন দেশাবিষ্কারক ! তোমার গ্রহের বর্ণনা বলো দেখি···

ব'লে ভৌগোলিক ওর বিরাট খাতাটা খুলে, কাটতে লাগল পেন্সিলের শিষ। দেশাবিষ্কারকদের বিবৃতিগুলিকে ভৌগোলিকেরা প্রথমে পেন্সিলেই লেখে। পরে, আবিষ্কারের যাথার্থ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলে, লিখে রাখে কালিতে।

—বলো এবার···ভৌগোলিক বলল, লিখতে উদ্যত হয়ে।

—ও···ছোট রাজকুমার বলল, আমার ওখানে তো সব কিছু খুব ছোট্ট—আর খুব একটা চিত্তাকর্ষকও নয়। আমার আছে তিনটি আগ্নেয়গিরি—দুটি জীবন্ত আর নিভে-যাওয়া আরেকটা···কিন্তু, কি জানি, বলা তো যায় না।

—তারপর ? ভৌগোলিক বলল।

—আমার আছে একটা ফুল।

—ফুলের কথা আমরা টুকে রাখি না, ভৌগোলিক বলল।

—বাঃ, রাখবেন না কেন? সব চেয়ে সুন্দর যে!

—ফুল অল্পায়ু ব'লে লিখি না।

—অল্পায়ু মানে?

—যাবতীয় বইয়ের মধ্যে সব থেকে দামী বই হল ভূগোলের বইগুলি। ভূগোলের বই তো আর অপ্রচলিত হয়ে যেতে পারে না। কদাচিৎ দেখা যায়, স্থানান্তরিত হয়ে গেছে এক পর্বত; কদাচিৎ দেখা যায়, শুকিয়ে গেছে এক সমুদ্র। আমরা তাই চিরস্থায়ী ছাড়া টুকে রাখি না অল্পায়ু কোনো কিছুই।

—কিন্তু ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি কি আবার জাগ্রত হয়ে উঠতে পারে না? ছোট রাজকুমার বলল। অল্পায়ু মানে?

—ঘুমন্ত হোক আর জাগ্রত হোক, আগ্নেয় হোক আর না হোক, তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না, ভৌগোলিক বলল। আসল কথাটা হচ্ছে—গিরি। গিরি তো আর বদলায় না; গিরি চিরস্থায়ী।

—অল্পায়ু মানে? ছোট কুমার একবার একটা প্রশ্ন ক'রে ফেললে ছাড়ার পাত্র সে নয়।

—অল্পায়ু মানে: আসন্ন মৃত্যু যার অবশ্যম্ভাবী।

—তবে কি আমার ফুলের আসন্ন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী?

—আলবৎ।

আমার ফুল অল্পায়ু, মনে মনে আক্ষেপ ক'রে বলতে লাগল কুমার। আর সেই চারটি কাঁটা তার আত্মরক্ষার একমাত্র সম্বল। হায়, ওকে একলা ফেলে এসেছি কেন?

ছোট কুমার এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। তারপর নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে সে বলল ঃ

—এবার কোন্ গ্রহের দিকে যাব, বলতে পারেন?

—পৃথিবী গ্রহেই যাও না কেন? ভৌগোলিক বলল। ওর নাম আছে খুব।

ছোট কুমার বিদায় নিল, তার ফুলটির কথা ভাবতে ভাবতে।

ষোলো

সপ্তম গ্রহ—পৃথিবী।

পৃথিবী আবার যে-সে গ্রহ নয়। এতে বাস করে একশো এগারো রাজা [আফ্রিকার সব রাজাকে নিয়ে অবশ্য], সাত হাজার ভৌগোলিক, নয় লক্ষ ব্যবসায়ী, পঁচাত্তর লক্ষ মাতাল, একত্রিশ কোটি আত্মাভিমানী—সবসুদ্ধ প্রায় দুশো কোটি বয়স্ক ব্যক্তি।

পৃথিবীর আয়তন সম্বন্ধে আপনাদের একটু ধারণা দিচ্ছি: বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কারের পূর্বে, পৃথিবীর ছ'টি মহাদেশে ব্যাপৃত ছিল চার লক্ষ বাষট্টি হাজার পাঁচশো এগারো বাতিওয়ালার অক্ষৌহিণী।

একটু দূর থেকে দেখলে, দৃশ্যটি দেখাত চমৎকার। বাতি জ্বালানোর এই অক্ষৌহিণীর গতায়াত ছিল ব্যালে-নাচের মতো নিয়ন্ত্রিত। প্রথমে আসত নিউজিল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার দল—বাতি জ্বেলেই ঘুমোতে যেত। আসত তখন চীন-সিবেরিয়ার পল্টন—আর ওরাও কাজটা সেরেই নেপথ্যে উধাও। তারপর যথাক্রমে রাশিয়া আর ভারত, আফ্রিকা

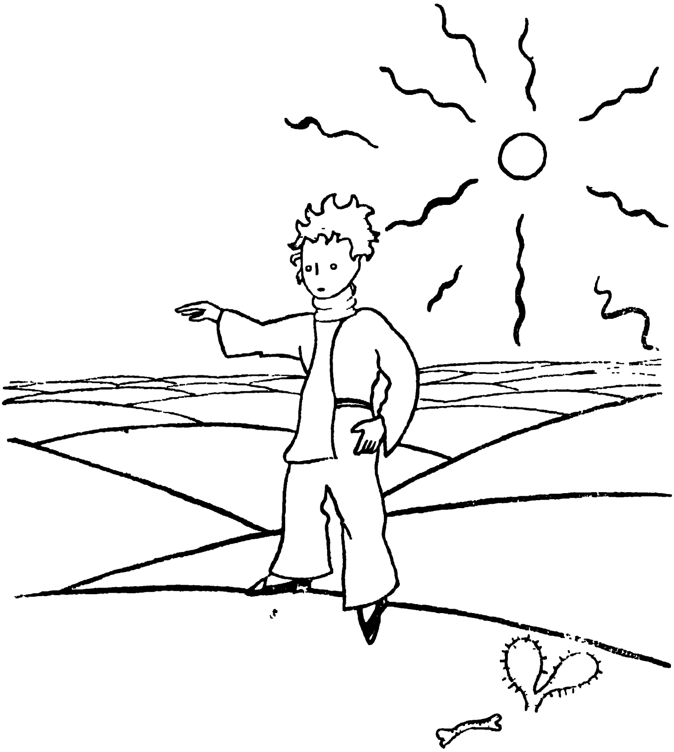
আর য়ুরোপ, দক্ষিণ আর উত্তর আমেরিকার ফৌজের আবির্ভাব-অন্তর্ধান। ওদের কোনো দিনই দেখা যায় নি প্রবেশ-প্রস্থানের ভুল। সত্যি সত্যি দেখাত চমৎকার।

শুধু উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর একমাত্র বাতি জ্বালানোর লোক দুটির জীবন কাটত আলস্যের ঔদাস্যে: বছরে ওরা মাত্র দুদিনই খাটত।

সতেরো

রসিকতা করতে গিয়ে লোকে প্রায়ই অনুভব করে, সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশিয়ে, ফলিয়ে বলার প্রলোভন। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমার সেই বাতিওয়ালার অক্ষৌহিণীর গল্পও অত্যুক্তি-বর্জিত নয়। আমাদের গ্রহের সঙ্গে যারা পরিচিত নয়, তাদের মনে জাগতে পারে ভ্রান্ত ধারণা। আসলে, পৃথিবীতে জনমানবের স্থান অতীব অল্প। বিশ্বের এই দুশো কোটি অধিবাসী একটু ঠাসা ঠাসা দাঁড়ালে —মিটিঙে যেমন দাঁড়ায়—ওদের জায়গা কুলোত লম্বায় চওড়ায় দশ ক্রোশের এক মাঠে। সমস্ত মানবজাতি অনায়াসে ধরতে পারত প্রশান্ত মহাসাগরের যে-কোনো এক ক্ষুদ্রতম দ্বীপে।

বয়স্ক ব্যক্তিরা অবশ্য এই কথা বিশ্বাস করবে না। ওরা ভাবে, বিরাট জায়গা জুড়ে ওরা বিরাজ করছে। ওরা ভাবে, অশ্বত্থের মতোই ওদের গুরুত্ব। কাজেই ওদের বরং বলুন অঙ্ক ক'ষে দেখতে। ওরা কিনা সংখ্যা-প্রিয়; অঙ্কটা ওদের ভালো লাগবে। আপনারা কিন্তু আমার কথা-ই বিশ্বাস করুন; সময় বাঁচাবেন।



ছোট কুমার পৃথিবীতে এসে, কাউকে না দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল; ভাবল, "বুঝি বা ভুল করেছি আমি, নেমেছি ভুল গ্রহে।" হঠাৎ দেখল বালির মধ্যে নড়া-চড়া করছে কি যেন এক বলয়, জ্যোৎস্নাবর্ণ এক বলয়।

—শুভরাত্রি, ছোট কুমার বলল, অনির্দিষ্ট সুরে।

—শুভরাত্রি, বলল সাপ।

—কোন্ গ্রহে পড়েছি, বলতে পারো কি?

—পৃথিবীতে, আফ্রিকায়···।

—ও!···পৃথিবীতে বুঝি মানুষ ব'লে কোনো জীব নেই?

—আছে বৈকি! তবে কিনা এখানে তো মরুভূমি। মরুভূমিতে লোক থাকে না। পৃথিবীটা, জানো, বিরাট··· সাপটা বলল।

ছোট কুমার একটা শিলাখণ্ডের উপর বসল, আকাশের দিকে চোখ তুলল:

—ভাবছি···তারা-নক্ষত্র ঝলমল করছে কেন? প্রতিজন যেন একদিন নিজের গ্রহ খুঁজে ফিরে পাই—তা-ই না? আমার গ্রহটিকে দেখতে পাচ্ছ? ঠিক আমাদের মাথার উপর। কিন্তু কত দূর!

—তোমার গ্রহটি সুন্দর, সাপ বলল। তবে এখানে যে হঠাৎ···

—এক ফুল নিয়ে বড় অশান্তি, ছোট রাজকুমার বলল।

—ওঃ···

ব'লে সাপটা চুপ ক'রে গেল। ছোট কুমার মৌন ভেঙ্গে বলল :

—মানুষ কৈ ? মরুতে কেমন যেন একা একা লাগছে···

—মানুষের মধ্যেও লাগত, উত্তর দিল সাপ।

ছোট কুমার সাপের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল :

—অদ্ভুত জীব তো···আঙ্গুলের মতো সরু !

—তবে রাজ-অঙ্গুলির চেয়েও শক্তিমান আমি।

ছোট কুমার মৃদু হাসল :

—শক্তিমান তুমি ?···তোমার ঠ্যাঙ পর্যন্ত নেই। হাঁটতে পারো কৈ ?

—তোমাকে নিয়ে যেতে পারি আমি অনেক দূরে। কোনো জাহাজও যেখানে যায় না···

ব'লে সাপ ছোট কুমারের গোড়ালি জড়াল সোনার নূপুরের মতো :

—যাকে স্পর্শ করি আমি, তাকে ফিরিয়ে দিই মাটিতে··· তার উৎসে। তুমি কিন্তু শুচি খুব···এসেছ সেই কোন্ নক্ষত্র থেকে।

ছোট কুমার কোনো উত্তরই দিল না। সাপটা ব'লে চলল :

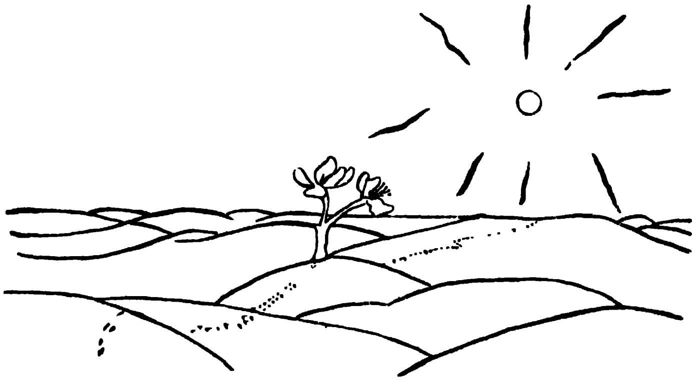


—এত দুর্বল তুমি···এই পাথুরে পৃথিবীতে এসেছ···কষ্ট লাগছে ভাবতে। জানো, কোনো দিন তোমার গ্রহের জন্য যদি মন-খারাপ করে বেশি···তোমাকে সাহায্য করতে পারি। তোমাকে আমি···

—বুঝেছি, ছোট রাজকুমার বলল। কিন্তু এত হেঁয়ালিতে কথা বলো কেন, বলো তো ?

—সব হেঁয়ালির রহস্য খুলে দিতে পারি, সাপটা বলল।

আর কেউ কিছু বলল না।



আঠারো

ছোট কুমার মরুর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে কাউকে আর দেখল না, দেখল শুধু এক ফুল. তিন-পাপড়ির এক নগণ্য ফুল।

—নমস্কার, ছোট রাজকুমার বলল।

—নমস্কার।

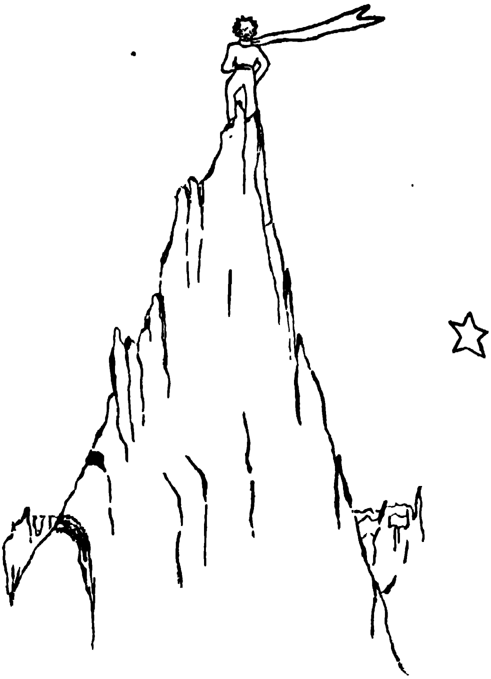
—মানুষ কোথায়? সবিনয়ে প্রশ্ন করল রাজকুমার।

ফুলটা একদিন এক বেদুইন দলকে দেখেছিল:

—মানুষ?···সে ·বলল। হ্যাঁ, আছে বটে। পাঁচ কি ছয়। ওদের দেখেছিলাম আমি। অনেক বছর আগে! কিন্তু ওদের যে কোথায় পাওয়া যায় তা তো বলা কঠিন: বাতাস ওদের উড়িয়ে নিয়ে যায়। ওদের শেকড় নেই কিনা! অসুবিধে খুব।

—তাহলে আমি আসি, ছোট রাজকুমার বলল।

—এসো।



উনিশ

ছোট কুমার এবার আরোহণ করল এক মস্ত পর্বতে। পর্বত বলতে ও শুধু জানত ওর গ্রহের সেই তিনটি জানুস্পর্শী আগ্নেয়গিরি। নিভে-যাওয়া আগ্নেয়গিরিটা ওর টুলের কাজ করত। "এমন উচ্চ পর্বতের শৃঙ্গদেশে উঠে দাঁড়িয়ে," ছোট রাজকুমার ভাবল, "এক দৃষ্টিতেই দেখতে পাব সারা পৃথিবীর

যত মানুষকে।" আসলে কিন্তু পর্বতমালার সুঁচের-মতো-ধারালো চূড়ো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

—নমস্কার, আনমনা সুরে সে বলল।

—নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার···উত্তর দিল প্রতিধ্বনি।

—তোমরা কে? ছোট রাজকুমার বলল।

—তোমরা কে? তোমরা কে? তোমরা কে?···প্রতিধ্বনি আবার।

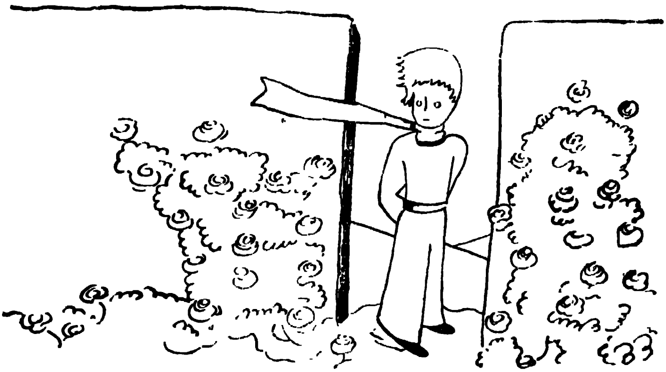
—আমার বন্ধু হবে? আমি যে বড় একা···

—বড় একা, বড় একা, বড় একা···

"অদ্ভুত গ্রহ! ছোট কুমার ভাবল। শুকনো খুব, ধারালো খুব—আর নোনা। আর, লোকগুলোর কল্পনাশক্তিও বড্ড কম। যা শোনে তা-ই পুনরুচ্চারণ করে মাত্র। আমার ওখানে এক ফুল ছিল···ও কিন্তু নিজ থেকেই কথা বলত।

কুড়ি

অবশেষে মরু, পাহাড় আর তুষারের মধ্য দিয়ে অনেক হাঁটার পর, ছোট কুমার দেখল—এক রাস্তা! আর রাস্তা-মাত্রই তো চলেছে মানুষের ওখানে।



—নমস্কার, ছোট রাজকুমার বলল।

সেখানে ছিল এক গোলাপ-বাগ।

—নমস্কার, গোলাপেরা বলল।

ছোট কুমার তাদের দেখতে লাগল নিবিষ্ট চিত্তে। ওরা যে ঠিক তার নিজের ফুলটির মতো দেখতে।

—তোমরা কে? ছোট কুমার জিগ্যেস করল, স্তম্ভিত হয়ে।

—আমরা গোলাপ।

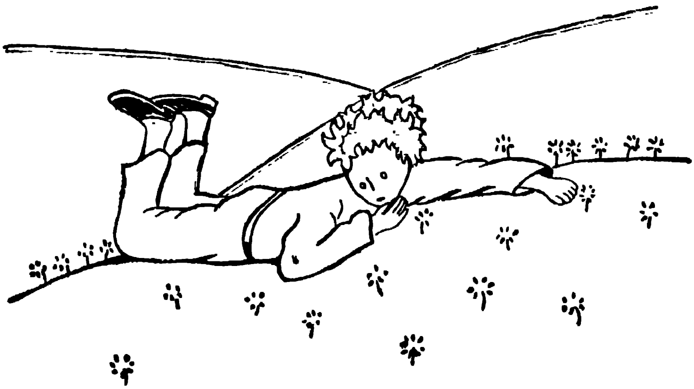
—ওঃ!···

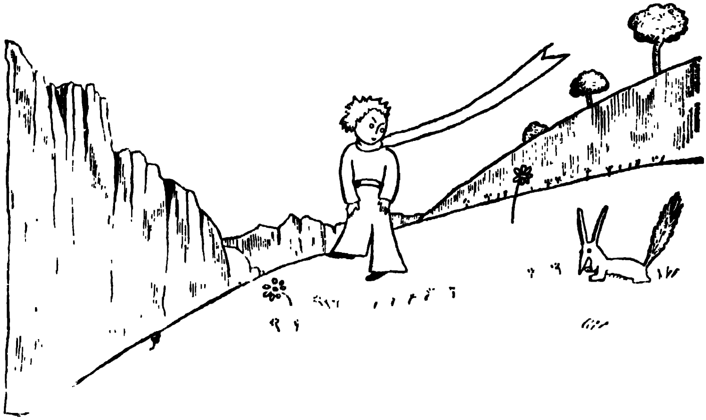
ছোট রাজকুমারের অত্যন্ত মন-খারাপ হতে লাগল। তার ফুল কি না বলেছিল, ব্রহ্মাণ্ডে ও জুড়িহীন, একেবারে অদ্বিতীয়। আর দেখো, শুধু এই একটিমাত্র বাগানেই ঠিক ওর মতন চার কি পাঁচ হাজার গোলাপ···।

"আমার ফুলটি, সে ভাবল, ওদের দেখতে পেলে কত-না বিরক্ত হয়ে যেত, কাশত খুব, ম'রে যাওয়ার ভান করত, আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্য। বাধ্য হয়ে আমাকেও ওর সেবাশুশ্রূষা করতে হত ভান ক'রে; নইলে, শুধু আমাকে জ্বালাবার জন্যই, ও সত্যি সত্যি ম'রে যেতে পারে।"

মনে মনে সে বলল, "ভেবেছিলাম, আমি অদ্বিতীয় এক ফুলের মালিক, আর দেখো, আমার আছে শুধুমাত্র সাদাসিধে

এক গোলাপ···। ওটা, আর জানুচুম্বী সেই তিনটি আগ্নেয়-গিরি নিয়ে (আর নিভে-যাওয়াটা তো, বোধহয়, আর জ্বলবেই না কোনো দিন···) আমি মস্ত বড়ই এক রাজকুমার বটে···" ব'লে, ঘাসে শুয়ে প'ড়ে ছোট রাজকুমার কাঁদতে লাগল।





একুশ

খেঁকশেয়াল এসে বলল :

—নমস্কার।

ছোট কুমার চারদিকে চোখ ফেরাল, কাউকে দেখতে পেল না। তবে, ভদ্রতার খাতিরে সে-ও বলল :

—নমস্কার।

—এই যে···শেয়াল বলল, আপেল গাছটার নিচে।

—তুমি কে? ছোট রাজকুমার বলল। বেশ ভদ্র তো!

—আমি এক খেঁকশেয়াল।

—আমার সঙ্গে খেলতে আসবে? রাজকুমার প্রস্তাব করল। মন কেমন কেমন করছে।

—তা কিন্তু আমি পারব না, শেয়াল বলল। আমি যে পোষা নই।

—ওঃ···মাফ কর।

তারপর একটু যেন চিন্তা ক'রে রাজকুমার বলল ঃ

—'পোষা' মানে ?

—তুমি, দেখছি, এখানকার নও। এসেছ কিসের খোঁজে ?

—মানুষের খোঁজে, ছোট রাজকুমার বলল। কিন্তু·· 'পোষা' মানে ?

—মানুষ, শেয়াল বলল, বন্দুক রাখে, শিকার করে। এক আস্ত বিড়ম্বনা! তবে মুর্গিও রাখে। আর তাতেই আমাদের লাভ। মুর্গি চাও ?

—না, মুর্গি আমি চাই না, ছোট রাজকুমার বলল। বন্ধু চাই। "পোষা" মানে ?

—মানে, অনেক-দিন-ভুলে-যাওয়া কিছু ঃ সম্বন্ধ পাতানো।

—সম্বন্ধ পাতানো ?

—হ্যাঁ, সম্বন্ধ পাতানো, শেয়াল বলল। ধর তোমার নিজের কথা।· তুমি এখনও, আমার চোখে, এক লক্ষ খোকার মতোই আরেক খোকা। তোমাকে আমার কোনো দরকার নেই। আর আমাকেও কোনো প্রয়োজন নেই তোমার। আমি তোমার চোখে লক্ষ খেঁকশেয়ালের মতোই

আরেক শেয়াল। কিন্তু আমাকে যদি পোষ মানাও, তবে আমাদের পরস্পরকেই পরস্পরের প্রয়োজন হবে। তুমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার কাছে অদ্বিতীয় হয়ে যাবে। আর আমিও অদ্বিতীয় হব তোমার চোখে।

—বুঝেছি। মানে, খানিকটা বুঝতে পেরেছি আর কি, ছোট রাজকুমার বলল। আমার আছে একটা ফুল—ও বুঝি আমাকে পোষই মানিয়েছে।

—তা হবে না কেন, শেয়াল বলল। পৃথিবীতে যা সব ঘটছে আজকাল···

—পৃথিবীতে কিন্তু নয়···ছোট কুমার সংশোধন ক'রে বলল।

খেঁকশেয়াল হকচকিয়ে গেল।

—তবে কোথায়? অন্য এক গ্রহে?

—অন্য এক গ্রহে।

—শিকারী আছে?

—নেই।

—কি মজা!···মুর্গি আছে?

—না!

—পুরো আনন্দ পাই কোথায়?···দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেয়াল বলল।

তারপর জের টেনে সে বলতে থাকে :

—বড় একঘেয়ে জীবন। আমি মুর্গি শিকার করি, মানুষ আমায় শিকার করে। মুর্গি ও মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যহীন দিন কাটাই। একেক সময়, জানো, ক্লান্তি লাগে। কিন্তু তুমি যদি আমাকে পোষ মানাও, তবে আমার জীবন যেন সূর্যালোকিত হয়ে উঠবে। এমন এক পদধ্বনি চিনতে শিখব যা অন্য সব পদধ্বনি থেকে ভিন্ন। অন্যদের পায়ের শব্দ



শুনেই আমি মাটির নিচে ফিরে যাই ছুটে···কিন্তু তোমারই পায়ের শব্দ আমায় ডাকবে গর্ত থেকে—বাঁশির সুরের মতো। তারপর দেখো···ওই দিকে শস্যক্ষেত। আমি রুটি খাই না। শস্যের কোনো প্রয়োজনই আমার নেই। শস্যক্ষেতের দৃশ্য আমার স্মৃতিপটে জাগায় না কোনো স্মৃতি। তাতেই দুঃখ। কিন্তু তোমার চুল তো সোনার মতো। তুমি যখন আমাকে পোষ মানাবে, আমার আনন্দ তখন দেখে কে? সোনালি শস্যক্ষেত মনে করাবে তোমার কথা। ভালোবাসব শস্যক্ষেতে বাতাসের গান।



খেঁকশেয়াল থামল, অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, রাজকুমারের দিকে একনিমেষে তাকিয়ে। অবশেষে সে বলল ঃ

—দয়া ক'রে·· আমাকে পোষ মানাও।

—আমি 'না' বলছি না, ছোট রাজকুমার বলল। কিন্তু সময়?···আমার যে কত বন্ধু খোঁজার আছে, কত কিছু শেখার আছে!

—তুমি যেটাকে সত্যি সত্যি জানতে চাইবে, সেটাকে সর্বপ্রথমেই পোষ মানানো দরকার, শেয়াল বলল। আজকাল কিন্তু ভালো ক'রে জানার মতো সময় মানুষের আর নেই। ওরা দোকানে তৈরি-করা জিনিস কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু বন্ধু তো হাটে-কেনা মাল নয়; কাজেই মানুষের আর বন্ধু জোটে না। বন্ধু চাও যদি···আমাকে পোষ মানাও।

—আচ্ছা, বেশ···কি করতে হবে, বলো দেখি! ছোট রাজকুমার বলল।

—ধৈর্য চাই, অনেক ধৈর্য চাই, শেয়াল বলল। প্রথমে এমনি ব'সে থাকবে ঘাসের মধ্যে···আমার কাছ থেকে কিছুটা দূরে। তোমার দিকে তাকাব আমি আড়চোখে। তুমি কিছু বলবে না। ভাষা-ই মনোমালিন্যের মূল। তারপর, ক্রমে ক্রমে রোজ রোজ একটু ক'রে কাছে এসে বসবে।

পরের দিন ছোট কুমার ফিরে এল খেঁকশেয়ালের কাছে। খেঁকশেয়াল বলল ঃ

—তুমি রোজ একই সময়ে আসতে চেষ্টা করবে, কেমন ? ধর, তুমি আসো রোজ বিকেল চারটেয় ; তিনটে থেকেই তবে সুখী হতে শুরু করব। তোমার আসার সময় যত ঘনিয়ে আসবে, ততই আনন্দ বোধ করব। চারটে বাজতে না বাজতেই অস্থির হয়ে, চঞ্চল হয়ে উঠব, আস্বাদ করব সুখের মূল্য। তুমি কিন্তু যদি যখন-তখন আসো, কেমন ক'রে জানব তাহলে, আমার হৃদয় উদ্‌গ্রীব ক'রে রাখতে হবে কোন্ সময় থেকে ?···রীতি চাই।

—রীতি ?

—এটাও অবশ্য অনেকদিন-ভুলে-যাওয়া কিছু···যার জন্য একদিন অন্যদিন থেকে পৃথক, এক ঘণ্টা অন্য সব ঘণ্টার চেয়ে মূল্যবান। ধর শিকারীদের কথা—ওদেরও তো রীতি আছে। প্রতি রোববার ওরা নাচতে যায় গ্রামবালাদের সঙ্গে। কাজেই আমার পক্ষে রোববার হল সত্যি সত্যি মজার দিন। আঙুর-ক্ষেত পর্যন্ত বেড়াতে যাই নিরাপদে। শিকারীরা যে-কোনো দিন নাচতে গেলে, দিন কাটত বড় একঘেয়ে, আর ছুটিও মোটেই মিলত না।

ছোট কুমার খেঁকশেয়ালকে পোষ মানাতে লাগল। যখন এল বিদায়ের দিন ঃ

—এবার কিন্তু, শেয়াল বলল, কাঁদব।

— তোমারই দোষ···ছোট রাজকুমার বলল। আমি কিন্তু তোমায় কখনো দুঃখ দিতে চাই নি···তুমিই কি না বলেছিলে পোষ মানাতে···

—হ্যাঁ, বলেছিলাম।

— তবে কাঁদবে যে? ছোট রাজকুমার বলল।

—কাঁদবই তো···।

—তাহলে তোমার লাভ হল কৈ?

—আমার লাভ?···শস্যক্ষেতের রঙে।

শেয়াল আবার বলল ঃ

—ফিরে যাও গোলাপ-বাগে···বুঝবে গিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তোমার গোলাপ অদ্বিতীয়। তারপর আবার এসো—বিদায় নিতে। তোমাকে তখন এক গোপন কথা বলব।

গোলাপ-বাগে ফিরে এসে ছোট কুমার বলল ঃ

—তোমাদের আর আমার ফুলের মধ্যে কত পার্থক্য। তোমরা এখনও কিচ্ছুই নও। কেউই তোমাদের পোষ মানায় নি, আর তোমরাও তো পোষ মানাও নি কাউকে। আমার শেয়াল যেমনটি ছিল প্রথমে, তেমনি তোমরা-ও আজ তা-ই। শেয়াল

তো প্রথমে ছিল লক্ষ লক্ষ খেঁকশেয়ালের মধ্যে এক শেয়াল। ওর সঙ্গে কিন্তু ভাব করেছি আমি ; ব্রহ্মাণ্ডে ও এখন অদ্বিতীয়।

গোলাপগুলো মাথা নোয়াল লজ্জিত ভঙ্গিতে।

—তোমরা সুন্দর···ছোট রাজকুমার বলল, কিন্তু শূন্য ; তোমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করা যায় না। আমার গোলাপ অবশ্য, পথের পথিকের চোখে, ঠিক তোমাদেরই মতো দেখতে। আসলে কিন্তু ও তোমাদের চেয়ে ক-ত মূল্যবান। ওকেই আমি লালন করেছি জলে। ওকেই রেখেছি কাঁচের ঢাকনির নিচে। ওকেই, ছাউনি টাঙিয়ে, বাঁচিয়েছি বাতাসের ঝাপটা থেকে। ওরই শুয়োপোকা মেরেছি [দুয়েকটি গুটি রেখে অবশ্য, প্রজাপতি যাতে জন্মায়···]। ওরই অভিযোগে কান পেতেছি···ওরই আত্মশ্লাঘা সয়েছি···শুনেছি ওর সব কথা···শুনেছি ওর মৌন—আমারই ফুল ব'লে।

তারপর খেঁকশেয়ালের কাছে এসে ছোট কুমার বলল :

—বিদায়···।

—বিদায়···উত্তর দিল খেঁকশেয়াল, "আমার সেই গোপন কথাটা শুনবে এবার ? সোজা কথা খুব : আসলটা চোখের আড়ালে ; অন্তরই তার নাগাল পায়।

—অন্তরই তার নাগাল পায়··· ছোট কুমার বলল, যাতে ভুলে না যায়।

—তোমার গোলাপের জন্য তুমি যে সময়টুকু খরচ করেছ, তার জন্যই ফুলটি মূল্যবান।

—আমার গোলাপের জন্য যে সময়টুকু খরচ করেছি··· ছোট কুমার বলল, যাতে ভুলে না যায়।

—এই সত্যটাকে মানুষে ভুলেছে, শেয়াল বলল। তুমি কিন্তু ভুলো না। যাকে তুমি পোষ মানিয়েছ তার উপর তোমার চির দায়িত্ব। তোমার গোলাপের জন্য তুমি দায়ী।

—আমার গোলাপের জন্য আমি দায়ী···ছোট রাজকুমার বলল, যাতে ভুলে না যায়।

বাইশ

—নমস্কার···বলল কুমার।

—নমস্কার···উত্তর দিল পয়েন্ট্‌স্‌ম্যান।

—তুমি এখানে কি করছ?

—যাত্রীদের বাছাই করি, হাজার হাজার ক'রে। ট্রেন-গুলো পাঠিয়ে দিই বাঁ দিকে, ডান দিকে।

হঠাৎ বজ্রগর্জন এক এক্‌স্প্রেস্‌ ট্রেন অন্ধকারে আলোর রেখা টেনে পয়েন্ট্‌স্‌ম্যানের ক্যাবিন্‌কে কাঁপিয়ে তীরবেগে এসে অন্তর্ধান করল।

—এত তাড়া কিসের? ছোট রাজকুমার বলল, ওরা কিসের খোঁজে যাচ্ছে?

—ইঞ্জিন-এর লোকটাও জানে না···পয়েন্ট্‌স্‌ম্যান বলল।

হঠাৎ আলোর রেখা টেনে উল্টোমুখী আর এক গাড়ির গর্জন।

—এক্ষুণি ফিরছে যে?···রাজকুমার প্রশ্ন করল।

—না, ওরা আর একদল, পয়েন্টস্‌ম্যান বলল। বদলাবদলি হচ্ছে।

—যেখান থেকে আসছে, সেখানে বুঝি ওরা খুশি ছিল না?

—মানুষ যেখানেই থাক না কেন, সেখানে সে খুশি হয় না।

শোনা গেল আর এক গর্জন।

—প্রথম দলকে ধরতে যাচ্ছে···তা-ই না? ছোট কুমার জিগ্যেস করল।

—ওরা আবার কি ধরতে যাবে? পয়েণ্টস্‌ম্যান বলল। ট্রেনে ব'সে ঘুমোয়, কিংবা হাই তুলে আড়মোড় ভাঙে। শুধু ছেলেরাই জানালার কাচে নাক চেপে তাকিয়ে থাকে।

—একমাত্র ছেলেরাই জানে, কি তারা চায়, ছোট রাজকুমার বলল। সময় নষ্ট করে তারা নেকড়ার এক পুতুলের সেবায়···তাই তাদের চোখে পুতুলের এত দাম। কেড়ে নিলে তারা কাঁদে।

—ওদের ভাগ্য বটে···পয়েণ্টস্‌ম্যান বলল।

তেইশ

—নমস্কার···বলল ছোট রাজকুমার।

—নমস্কার, দোকানী বলল।

ঐ দোকানে বিক্রি হত তেষ্টা মেটাবার বড়ি। সপ্তাহে একটা ক'রে খেলে, আর জলপিপাসা লাগে না।

—ও সব বিক্রি করছ কেন? ছোট কুমার জিগ্যেস করল।

—এতে অনেক সময় বাঁচে যে···চাই কি, হপ্তায় তেপ্পান্নো মিনিট···বিশেষজ্ঞরা হিসেব ক'রে দেখিয়েছে।

—আর ঐ তেপ্পান্নো মিনিটে 'লোকে কি·করে?

—করে আর কি?···দোকানী বলল। যা খুশী, তা-ই করে।

"আমার হাতে তেপ্পান্নো মিনিট থাকলে," ছোট রাজকুমার ভাবল, "হেঁটে যেতাম, আলতো পায়ে, কোনো ফোয়ারার সন্ধানে।"

চব্বিশ

আট দিন হয়েছে প্লেনসুদ্ধ পড়েছি আফ্রিকার সেই মরু-প্রান্তরে। দোকানদারের ওই গল্প শুনতে শুনতে পান করেছি আমার জলের শেষ ফোঁটাটি। কুমারকে বললাম :

—বেশ মজার তোমার সব গল্প···ইতিমধ্যে কিন্তু প্লেনটা যে সারানো হল না! আর জলও এদিকে শেষ! আমিও খুশি হতাম, এবার যদি হেঁটে যেতাম, আলতো পায়ে, কোনো ফোয়ারার সন্ধানে।

—আমার বন্ধু খেঁকশেয়াল···

—দেখো, সোনা, শেয়াল-টেয়ালের গল্প আর ভালো লাগছে না!

—লাগছে না?···লাগছে না কেন?

—আমাদের যে ম'রে যেতে হবে তেষ্টায়।

আমার যুক্তি সে বুঝল না, বলল :

—বন্ধুলাভ-ই বড় সৌভাগ্য; তা তেষ্টায় ম'রেও যদি যাই। শেয়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলাম ব'লেই আমার এত আনন্দ।

মনে মনে ভাবছিলাম, ও বোঝে না আমাদের বিপদের

গুরুত্ব! ওর খিদেও লাগে না, তেষ্টাও লাগে না—একটুকরো রোদ্দুরেই ওর কুলোয়।

ও আসলে কিন্তু বুঝেছিল আমার ভাবনার কথা; আমার দিকে তাকিয়ে বলল :

—আমারও তেষ্টা লেগেছে। চলো, আমরা এক পাতকুয়োর খোঁজে যাই।

মাথা নাড়লাম নিরাশভাবে···কে বেরুবে, বলুন, অনির্দেশে, মরুভূমির বিশালতায়, এক পাতকুয়োর খোঁজে? তবু যন্ত্র-চালিতের মতো উঠে চলতে লাগলাম।

চলতে লাগলাম দুজনে, অনেক পথ, মৌন থেকে। রাত্রি নামল; জ্বলতে লাগল তারামণ্ডল। স্বপ্ন দেখছিলাম যেন, তৃষ্ণাতুর, জ্বরগ্রস্ত হয়ে। ছোট কুমারের কথাগুলো নৃত্য করছিল আমার স্মৃতিপটে।

—তাহলে তোমারও তেষ্টা পেয়েছে?

ছোট কুমার আমার প্রশ্নের উত্তর দিল না, শুধু বলল :

—গলার জন্য কেন, অন্তরের জন্যও জল ভালো।

ওর কথাটা আমি বুঝলাম না, তবুও চুপ ক'রে রইলাম, কোনো প্রশ্ন আর করলাম না।

ও হঠাৎ শ্রান্ত হয়ে বসল। আমিও বসলাম ওর পাশে। তখন মৌন ভেঙে ও বলল :

—তারাগুলো সুন্দর···একটা ফুলের জন্য···যাকে দেখা-ও যাচ্ছে না··· ।

বললাম, "নিশ্চয়ই" সম্মতির ভঙ্গিতে ; জ্যোৎস্নালোকে বিস্তৃত বালুকার ঢেউ দেখতে লাগলাম আনমনে ।

—মরুভূমিও সুন্দর ! ছোট রাজকুমার বলল ।

সত্যি তা-ই । মরুভূমিকে আমি অনেক দিন থেকে ভালোবাসতে শিখেছি । বালুকার এক ঢিপিতে বসুন··· দেখবেন না কোনো কিছু, শুনবেন না কোনো কিছু । তবুও সেই মৌনের মধ্যেই বাজে কিসের যেন প্রতিধ্বনি ।

—মরুপ্রান্তর এত সুন্দর কেন, জানো ?···ছোট রাজকুমার বলল । তার গর্ভে কোনো স্থানে লুকিয়ে থাকা এক ফোয়ারার জন্য ।

হঠাৎ বুঝলাম, বালুকার মধ্যে এই রহস্যময় কি-যেন-কিসের প্রতিধ্বনির অর্থ । ছোটবেলায় যে পুরোনো ভিটেয় থাকতাম, লোকে বলত তাতে নাকি এক গুপ্তধন পোঁতা আছে ; কেউই অবশ্য তার ঠিকানা পায় নি, খোঁজেও নি বোধ হয় । গুপ্তধনটা কিন্তু সারা বাড়ির উপর একটা যাদুজাল ফেলেছিল—বাড়িটা এক গোপন কথা রেখেছিল ওর অন্তরের অন্তরতমে··· ।

বললাম :

—হ্যাঁ, ঠিক তা-ই; বাড়ি বলো, তারা বলো, মরু বলো, ওরা যার জন্য সুন্দর তা-ই অদৃশ্য।

—তুমিও তাহলে আমার খেঁকশেয়ালের সঙ্গে একমত···

ছোট রাজকুমারের চোখে ঘুম আসছিল; ওকে কোলে নিয়ে আবার চলতে লাগলাম, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে। এত কোমল··· আর এত দুর্বল সে···। মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে এত দুর্বল বুঝি আর কিছু নেই। জ্যোৎস্নায় ভেসে উঠছিল ওর ফেকাশে পাণ্ডুর মুখ, নিমীলিত চোখ আর সোনালি কেশগুচ্ছ বাতাসে কম্পমান। ভাবছিলাম, যা দেখছি তা খোলস-ই মাত্র; আসলটা চোখের আড়ালেই।

হঠাৎ দেখলাম ওর অর্ধোন্মুক্ত ওষ্ঠে স্মিতহাসির অঙ্কিত এক রেখা। মনে মনে বললাম: "এই নিদ্রিত ছোট রাজকুমারের মধ্যে সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী হচ্ছে ওর ফুলটির প্রতি বিশ্বস্ততা। ওর অন্তরে, ঘুমের মধ্যেও, জ্বলছে—প্রদীপের এক শিখার মতো—এক গোলাপের প্রতিচ্ছবি···" হ্যাঁ, কোমল আর দুর্বল বটে। প্রদীপ সযত্নে রাখতে হয়—বাতাসের ঝাপটায় যাতে নিভে না যায়।

চলতে চলতে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এক পাতকুয়োর সন্ধান পেলাম।

পঁচিশ

—মানুষ, ছোট রাজকুমার বলল, এক্স্প্রেস্ ট্রেনে ওঠে বটে, জানে না কিন্তু কিসের খোঁজে। কাজেই মহাব্যস্ত হয়ে শুধু ঘোরাফেরা করে···।

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলল :

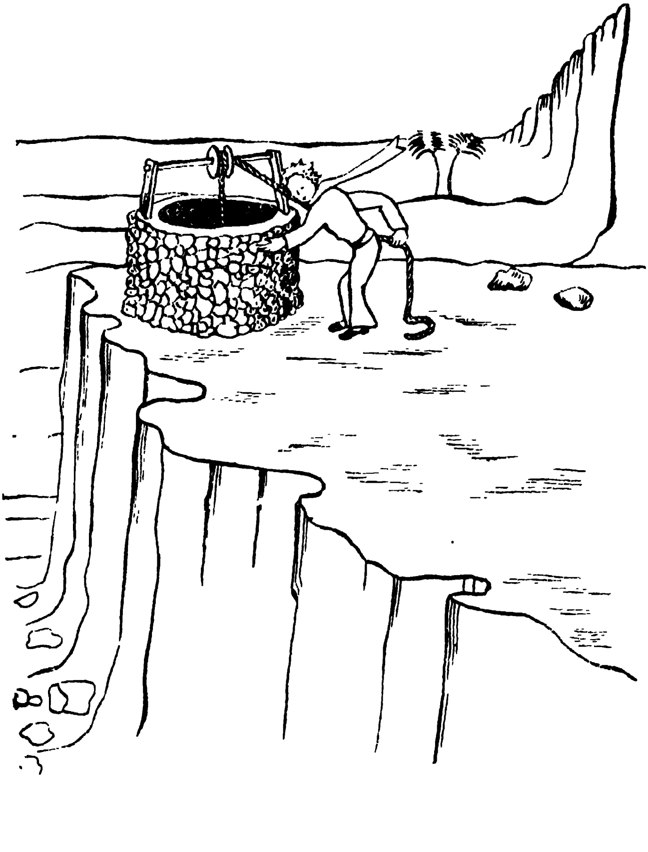
—তাতে লাভ ?

যে-কুয়োতে এসেছিলাম ওটা কিন্তু সাহারা-দেশের কুয়োর মতো নয়। সাহারা-দেশের কুয়ো তো বালিতে খোঁড়া গর্ত মাত্র। ওটা কিন্তু দেখাচ্ছিল ঠিক আমাদের গ্রামের কুয়োর মতো। গ্রামের কুয়ো বটে···কিন্তু গ্রাম কৈ ?···আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম। রাজকুমারকে বললাম :

—অদ্ভুত তো···সবই প্রস্তুত : দড়ি, বালতি আর কপিকল।

ও কিন্তু উত্তর দিল না কিছু, শুধু হাসল ; আর দড়িটাকে ধ'রে চালাতে লাগল কপিকল। কপিকল গোঙাতে লাগল, গোঙায় যেমন মরচে-ধরা বায়ু-মোরগ বাতাসের দীর্ঘনিদ্রার পর।

—শুনতে পাচ্ছ ?·· ছোট রাজকুমার বলল। কুয়োকে তুলেছি আমরা ঘুম থেকে···ও এবার গান ধরেছে।



ওকে আর কোনো পরিশ্রম করতে দেব না স্থির করেছিলাম, বললাম ঃ

—ছাড় এবার ; আমি নিজেই জল তুলব।

আস্তে আস্তে বালতিটা তুলে নিলাম কুয়োর কিনারায়। খাড়া ক'রে রাখলাম। কানে বাজতে থাকল কপিকলের গান। কম্পিত জলের মধ্যে দেখছিলাম সূর্যদেবকে কাঁপতে।

—ওই জলের জন্য আমার তেষ্টা পেয়েছে···

ব'লে ছোট রাজকুমার অঞ্জলি ক'রে হাত পাতল। বুঝলাম তখন, কিসের খোঁজে তার বেরোনো।

তার ঠোঁট পর্যন্ত বালতি তুললাম। সে পান করল, চোখ বুজে। মধুর লাগছিল খুব—উৎসবের মতো মধুর। এই জল তো আর সামান্য পানীয় নয়। তারা-খচিত আকাশতলে ভ্রমণ, কপিকলের গান আর আমার বাহুর পরিশ্রমেই তার জন্ম। সেই জল, সত্যি, অন্তরকে জুড়োয় উপহারের মতো। ঠিক যেন ছেলেবেলার ক্রিস্‌মাস্‌-ট্রির সেই আলো, মধ্যরাত্রের উপাসনার সেই ঐকতান, আত্মীয়দের সেই স্মিতমুখ—যার দরুন বড়দিনে পাওয়া উপহারটি ভ'রে উঠত এক বিশেষ আঘ্রাণে।

—তোমার ওখানকার লোকেরা, ছোট রাজকুমার বলল, একই বাগানে করে পাঁচ হাজার গোলাপের চাষ···তবে যা খোঁজে, পায় না তার সন্ধান।

—পায় না তার সন্ধান···আমি বললাম প্রতিধ্বনির সুরে।

—তবু ওরা যার খোঁজে বেরিয়েছে, তা-ই পেতে পারত একটা ফুলের মধ্যে···একটু জলের মধ্যেই।

—একটু জলের মধ্যেই···।

—চোখ অন্ধ···ছোট রাজকুমার বলল। অন্তর দিয়েই খুঁজতে হয়।

জল খেয়েছিলাম। তাজা বোধ করছিলাম। মরু-প্রান্তরের বালুকা সূর্যোদয়ে মধুবর্ণ যেন। এই মধুবর্ণের জন্যও আমার আনন্দ। তবে এত দুঃখ কেন মনে?

—তোমার সেই প্রতিজ্ঞাটা কিন্তু তোমাকে রাখতেই হবে···আমার পাশে ব'সে ছোট রাজকুমার বলল।

—কিসের আবার প্রতিজ্ঞা?

—মনে নেই?···ভেড়ার জন্যে সেই জালতি?···আমার ফুলের উপর, জানো, আমার দায়িত্ব আছে।

পকেট থেকে বার করলাম এই আট দিনে আঁকা আমার সব খসড়া। দেখামাত্রই ছোট রাজকুমার স্মিতমুখে ব'লে উঠল:

—তোমার অশ্বত্থগাছ, জানো···ফুলকপির মতো দেখতে!

—ওঃ···!

আর ঐ অশ্বত্থ নিয়েই কিনা এত গর্ব ছিল আমার।

—তোমার খেঁকশেয়াল···দেখো না ওর কান দুটো। হরিণের শিঙের মতো···আর কি লম্বা !·· হাসতে হাসতে কুমার বলল।

—তুমি কিন্তু অন্যায় বিচার করছ, সোনা। জানো তো, বন্ধ আর খোলা বোড়া সাপের ছবি ছাড়া আর কিছুই আঁকতে শিখি নি জীবনে।

—ভেবো না···ছোট রাজকুমার বলল, ছোটরাই বুঝে নেবে।

জালতি আঁকলাম। বুক করছিল দুরু দুরু। খসড়াটা ওর হাতে রেখে বললাম ঃ

—আমি কিন্তু বুঝি না তোমার সঙ্কল্প।

ছোট কুমার উত্তর দিল না। বলল ঃ

—জানো···কালকেই আমার পৃথিবীতে-নেমে-আসার এক বছর পূর্ণ হবে।

একটু চুপ ক'রে সে আবার বলতে লাগল ঃ

—এইখানে···এইখানের কাছাকাছিই পড়েছিলাম···

ওর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

আবার, কি জানি কি কারণে, আমার যেন অস্বাভাবিক অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। হঠাৎ বললাম ঃ

—বুঝেছি। এই আট দিন হয়েছে, তোমার সঙ্গে প্রথম

যখন দেখা হয়, তুমি যখন ঘুরছিলে নিঃসঙ্গ হয়ে, লোকালয় থেকে এক হাজার মাইল দূরে, তার একটা কারণ ছিল! তুমি ফিরে যাচ্ছিলে তোমার নেমে-আসার জায়গাটিতে···তা-ই না?

ছোট রাজকুমারের মুখ আরও রক্তিম হয়ে উঠল।

আমি আবার বললাম, একটু যেন সঙ্কোচের সঙ্গে :

—বার্ষিকীর জন্য, তা-ই না?

কুমারের গাল দুটো এখন রীতিমতো লাল। ও তো কোনো প্রশ্নের উত্তর দিত না···ঐ রক্তিম আভা-ই ছিল তার উত্তর।

—আ···আমি বললাম, আমার ভয় পাচ্ছে যে বড়!

ও কিন্তু আমাকে আর কিছু বলতে দিল না :

—তোমার এখন কাজ আছে। প্লেনের কাছে ফিরে যাও। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। এসো আবার কাল সন্ধ্যায়।

তবুও আশঙ্কা গেল না। খেঁকশেয়ালের কথা মনে আসছিল। একদিন পোষ মেনেছে যারা, একদিন তাদের কাঁদতে হয়···।

ছাব্বিশ

কুয়োর পাশে ছিল পাথরের এক পাঁচিলের ভগ্নাবশেষ। পরের দিন সন্ধ্যাবেলায়, ফিরলাম যখন কাজটাজ সেরে, দূর থেকে লক্ষ্য করলাম ওই পাঁচিলে ব'সে আছে কুমার, শূন্যে পা ঝুলিয়ে। কার সঙ্গে কথা বলছিল।

—মনে আছে তো ?···কিন্তু ঠিক এইখানে নয়।

কার যেন উত্তর পেয়ে ও আবার বলল :

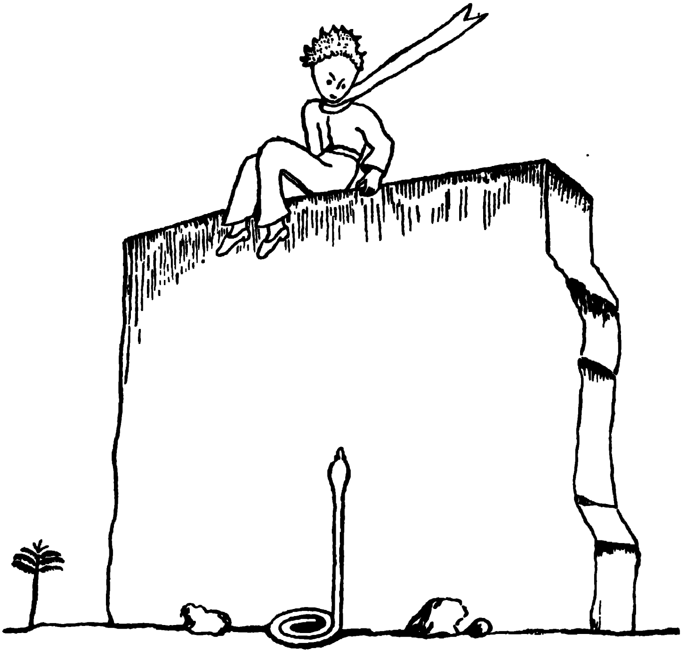
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজকেই বটে···তবে ঠিক এই জায়গাটিতে নয়।

পাঁচিলের দিকে এগিয়ে আসছিলাম। ছোট কুমার ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, আর কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম না। কুমার তবু আবার বলল :

—নিশ্চয়ই। বালিতে তো আমার পায়ের দাগ দেখতে পাবে···ওইখানেই আমার জন্য অপেক্ষা করবে···আমি ঠিকই আসব···আজ রাতে।

আমি তখন পাঁচিল থেকে মাত্র কুড়ি গজ দূরে ; তবুও কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

একটু চুপ ক'রে থেকে ছোট কুমার আবার বলল :



—তোমার ভালো বিষ আছে তো? আমাকে ভুগতে হবে না বেশি?

থামলাম, শিউরে উঠলাম, তবু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

—চলো এবার, ছোট রাজকুমার বলল, আমি নামব।

পাঁচিলের তলদেশে চোখ নামিয়ে লাফিয়ে উঠলাম… ঐখানেই, ছোট রাজকুমারের দিকে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পীতবর্ণ এক সর্প—ভয়াবহ যার বিষদাঁত।

দৌড়োতে দৌড়োতে আমার পকেট হাতড়াতে লাগলাম পিস্তলের সন্ধানে।

সাপটা কিন্তু, আমার পায়ের শব্দ শুনেই বালুকার উপর দিয়ে ভেসে চলল—ক্ষীয়মাণ ঝর্ণার মতো। অনতিত্বরিত গতিতে, এক মৃদু ধাতব শব্দে, পাথর-স্তূপে প্রবেশ ক'রে অন্তর্হিত হল সে।

আমি পাঁচিলের কাছে পৌঁছোনো মাত্রই ছোট কুমার আমার কোলে এসে পড়ল: তুষারের মতো শুভ্র তার মুখ।

—এ কি?…তুমি আবার কোত্থেকে শিখেছ সাপের সঙ্গে কথা কলতে?

খুলে দিলাম ওর সোনালি কণ্ঠাবরণ। ভিজিয়ে দিলাম ওর রগ। ওকে জল খাওয়ালাম: কিন্তু কোনো প্রশ্ন করার

আমার সাহস ছিল না। ও শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকল, আমার গলা জড়িয়ে। ওর হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল শিকারীর-গুলি-খাওয়া মুমূর্ষু এক পাখির মতো···। বলল :

—তোমার প্লেন সারাতে পেরেছ জেনে বড়ই সুখী হলাম··· এবার বাড়ি ফিরতে পারবে।

—কেমন ক'রে জানলে ?

সত্যিই···আমি ওকে জানাতে এসেছিলাম প্লেন মেরামতের আশাতীত সুসংবাদ।

আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে ও বলল :

—আমিও আজ বাড়ি ফিরছি···

তারপর একটু যেন বিষণ্ণ সুরে :

—অনেক দূর···আর কঠিনও কম নয়।

বুঝলাম অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে। ওকে কোলে চেপে জড়িয়ে ধরলাম, কিন্তু বৃথা : ও যেন অতল এক গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে, আটকানো যাবে না।

বড় গভীর দেখাচ্ছিল—গম্ভীর ও আত্মহারা।

—তোমার ভেড়া নিয়ে যাব। আর ভেড়ার জন্য বাক্সটা। আর জালতি···ম্লান হাসি হেসে ও বলল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। যখন বুঝলাম ওর শরীর একটু একটু উষ্ণ হয়ে উঠেছে, বললাম :

—সোনা, তোমার ভয় করেছিল খুব···না ?

করেছিল বটে, তবে সস্মিত মুখে সে বলল :

—আরও বেশি করবে···আজ সন্ধ্যায়।

আমার রক্ত যেন হিম হয়ে উঠেছে, অনিবার্যের অবশ্যম্ভাবিতায়। ছোট কুমারের হাসি আর শুনব না কোনো দিন—কথাটা ভাবতেও অসহ্য লাগছিল। ওর খিলখিল হাসি আমার কাছে ছিল মরুপ্রান্তরে এক ফোয়ারার মতো।

—সোনা, তোমার হাসি শুনতে চাই···আরও শুনতে চাই।

ও কিন্তু শুধু বলল :

—এই রাত্রেই এক বছর পুরো হবে। গত বছরে যে জায়গাটায় পড়েছিলাম, ঠিক তার উপরই দাঁড়াবে এসে আমার তারা।

—বলো, সোনা···তারার নিচে সাপের সঙ্গে সেই সাক্ষাতের কথা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না··· ।

ছোট রাজকুমার কোনো উত্তর না দিয়েই বলল :

—যা আসল, তা চোখের অদৃশ্য।

—নিশ্চয়ই।

—যেমন ধরো ফুলটির কথা। কোনো তারার এক ফুলকে তুমি যদি ভালোবাস, কত মধুর লাগে রাতে আকাশের দিকে চেয়ে তাকাতে···তারামাত্রই যেন ফুলে ফুলে ভরা।

—নিশ্চয়ই।

—আবার ধরো জল। আমাকে যে-জল খেতে দিয়েছিলে তুমি, সে-জল ছিল গীতিময়—কপিকল আর দড়ির গানে···মনে আছে কি? বড়ই ভালো লেগেছিল খেতে।

—নিশ্চয়ই।

—রাত্রে তুমি তারাদের দিকে তাকাবে। আমার তারা খুব ছোট্ট—তাই তোমাকে দেখাতে পারব না। তুমি ধ'রে নেবে আমার তারাটা ওই তারাগুলির মধ্যে এক তারা। আমার সেই তারাটির জন্য তুমি সব তারাকেই দেখতে ভালোবাসবে। তারামাত্রই হবে তোমার বন্ধু। আর জানো, তোমাকে এক উপহার দেব···

ব'লে ছোট রাজকুমার খিল খিল ক'রে হাসতে লাগল।

—আঃ সোনা, লক্ষ্মী আমার, তোমার সেই হাসি কত ভালো লাগে শুনতে!···

—সেটাই হবে আমার উপহার···।

—মানে?

—মানে···বিভিন্ন লোকের কাছে তারাদের বিভিন্ন অর্থ আছে। যাত্রীদের চোখে তারা-ই পথের দিশারী। বিজ্ঞানীদের চোখে সমস্যা। আর আমার সেই ব্যবসায়ীটির চোখে সোনা।

ওদের সবার কাছে কিন্তু তারারা ভাষাহীন। শুধু তোমারই সঙ্গে ওরা মূক থাকবে না।

—মানে ?

—মানে···রাত্রে, আকাশের তারাদের দিকে তাকাবে যখন, ভাববে আমি তাদের একটিতে বাস করি, তাদের একটিতে হেসে থাকি আমি—কাজেই তোমার কাছে তারা-মাত্রই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, তোমার কাছে তারামাত্রই হাসিতে মুখরিত।

—বিদায়দুঃখ থেকে তুমি সেরে উঠবে যখন [আর জানো, সব দুঃখ থেকেই মানুষ সেরে ওঠে], আমাকে চিনেছ ব'লেই তোমার আনন্দ হবে। আজীবন হয়ে থাকবে তুমি আমার বন্ধু। দেখবে···মধ্যে মধ্যে তোমার হাসি পাবে, আমার সঙ্গে হাসতে চাইবে তুমি। মধ্যে মধ্যে জানলা খুলবে—এমনি, হঠাৎ, অকারণে। আর তোমার বন্ধুরা সব আশ্চর্য হয়ে দেখবে, তুমি হাসছ আকাশের দিকে তাকিয়ে। তুমি তখন ওদের বলবে, "হ্যাঁ, তারাদের দেখেই হাসি আসে···"। ওরা ভাববে, তুমি পাগল হলে। মজা খুব, না ?

ও আবার হাসল।

—তারারা তোমার চোখে যেন আর তারা নয়···কোটি কোটি হাসিভরা নূপুর।

তারপর গম্ভীর হয়ে ছোট রাজকুমার বলল ঃ

—আজ রাতে কিন্তু আসবে না।

—তোমাকে ছাড়ব না।

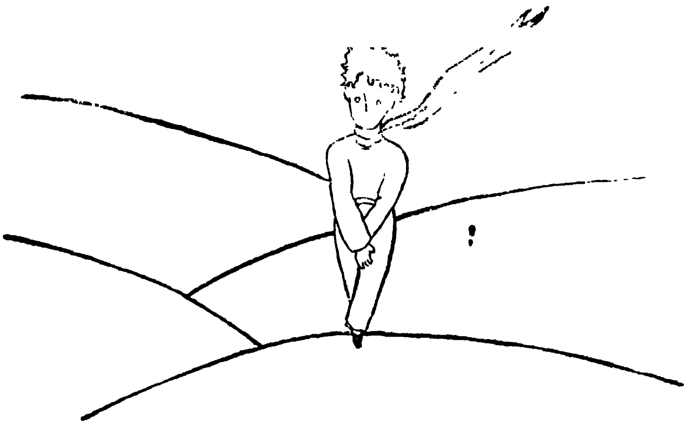
—তুমি ভাববে, কষ্ট পাচ্ছি···একটু যেন ম'রে যাচ্ছি। শোনো···এলে তোমার কি লাভ? তুমি এসো না।

—তোমাকে ছাড়বই না।

ওকে বড় চিন্তিত দেখাচ্ছিল এবার।

—ও-সব বলছি সাপের জন্যও···তোমাকে পাছে কামড়ায়। সাপ জীবটা, জানো, বড় ক্রূর। এমনি-ও লোককে কামড়াতে পারে।

—তোমাকে ছাড়বই না।



হঠাৎ একটা কিছু ভেবে ও যেন আশ্বস্ত বোধ করল :

—তবে হ্যাঁ···দ্বিতীয় কামড়ের জন্য ওদের আর বিষ থাকে না।

···সেই রাত্রে ও যখন রওনা হল, আমি মোটেই টের পেলাম না। চলেছিল কোনো সাড়া শব্দ না ক'রে। ওর নাগাল পেলাম যখন, দেখলাম, যাচ্ছে দৃঢ় দ্রুত পদক্ষেপে।

—ওঃ···এসেছ ? তবুও এসেছ ?···ব'লে ও আমার হাত ধরল।

পরে, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল :

—তোমার আসা উচিত হয় নি···কষ্ট পাবে···ভাববে আমি মৃত ; আসলে কিন্তু তা নয়।

চুপ ক'রে রইলাম।

—বুঝতে পারো তো···অনেক পথ···এই গুরুভার শরীরটাকে নিয়ে তো আর যেতে পারি না।

চুপ ক'রে রইলাম।

—শরীরটা দেখাবে প'ড়ে-যাওয়া শুকিয়ে-যাওয়া গাছের ছালের মতো। শুকনো ছালে লোকে কি দুঃখ পায় ?

চুপ ক'রে রইলাম।

ও যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ল—আমাকে মৌন দেখে। পরে, বহু কষ্টে, আবার বোঝাতে শুরু করল :

—সুন্দর হবে খুব, জানো···। আমিও তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকব। তারামাত্রই হবে মরচে-ধরা-কপিকল-সুদ্ধ কুয়োর মতো···আমাকে খাওয়াবে সেই জল।

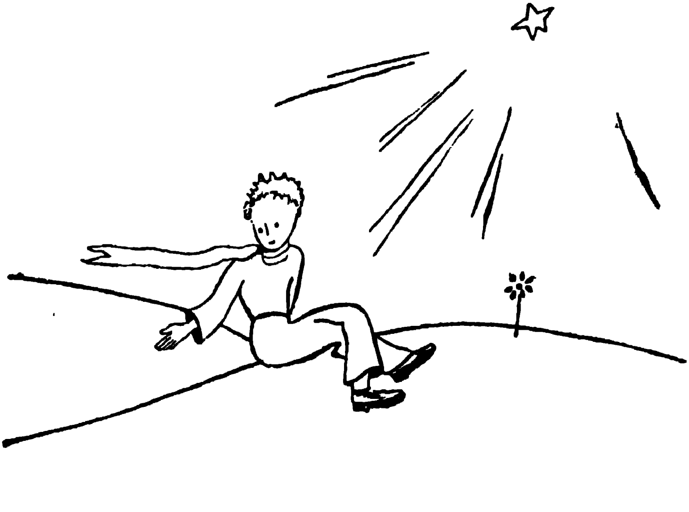
চুপ ক'রে রইলাম।

—মজা হবে খুব···তোমার হবে পাঁচ কোটি নূপুর··· আমার হবে পাঁচ কোটি ফোয়ারা।

ও-ও এবার চুপ করল। কাঁদছিল।

—ঐখানে···। আমাকে এবার একাই যেতে দাও···

ব'লে কিন্তু ও ব'সে পড়ল, ওর ভয় করছিল।



আবার বলল :

—জানো, আমার ফুল···আমি ওর জন্য দায়ী। এত দুর্বল ও···এত নির্বোধ। ওর আছে শুধু চারটি কচি কাঁটা : সংসার থেকে রক্ষা পাওয়ার ওর একমাত্র সম্বল।

আর দাঁড়াতে পারলাম না, আমিও বসলাম। ছোট কুমার তখন বলল :

—ঐ যে আসছে··· ।

প্রথমে ও যেন একটু ইতস্তত করল, পরে উঠল। এগুল। আমি কিন্তু একপাও নড়তে পারছিলাম না।

শুধু দেখলাম ওর গোড়ালির কাছে যেন এক বিদ্যুৎ। এক মুহূর্তের জন্য ও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কাঁদল না। তারপর প'ড়ে গেল, আস্তে আস্তে, প'ড়ে যায় যেমন একটা গাছ—বালুকায়। শোনা গেল না কোনো শব্দ।

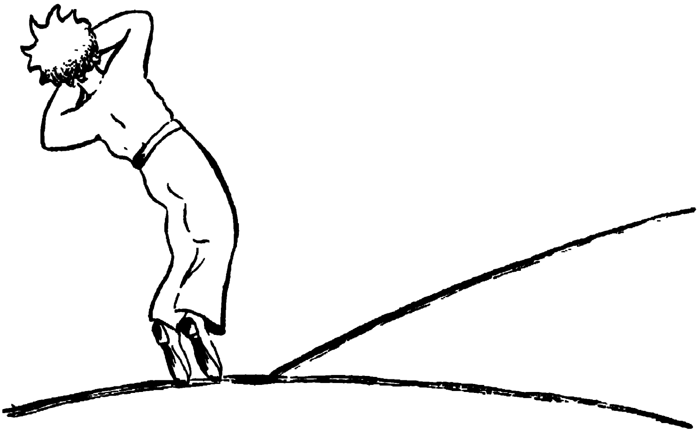
সাতাশ

আর এখন···কেটে গেল সুদীর্ঘ ছ'বছর। কাউকে বলি নি রাজকুমারের কথা। বন্ধুরা সব আমাকে ফিরে পেয়ে মেতে উঠল আনন্দে আর গর্বে, মরুতে মরি নি ব'লে। আমার তবু দুঃখ করছিল খুব। বলছিলাম, "ক্লান্ত তো খুব···সেরে যাবে।"

সেরেছে অবশ্য। আর তবু সারে নি পুরোপুরি। জানি, ছোট রাজকুমার নিজের গ্রহে ফিরেছে; পরের দিন সূর্যোদয়ে দেহটিকে আর পাই নি। এমন কিছু ভারী দেহ তার ছিল না···। শুনতে শিখেছি রাতে তারাদের গান···পাঁচ কোটি নূপুরের গান।

একটা প্রশ্ন কিন্তু আমাকে বড় ভাবিয়ে তুলেছে। যে জালতিটা এঁকেছিলাম, তার ছিল না কোনো চামড়ার বেল্ট। ছোট রাজকুমার নিশ্চয়ই সেটাকে পরাতে পারে নি ভেড়াটার মুখে। তবে ভাবছি: কি হল গ্রহটিতে? ভেড়াটা বোধ হয় ফুলটি খেয়ে ফেলেছে।

মাঝে মাঝে ভাবি: "না···ছোট কুমার তো প্রতি রাতেই ফুলটি রাখে কাচের ঢাকনিতে···ভেড়ার ওপর সযত্নে নজর



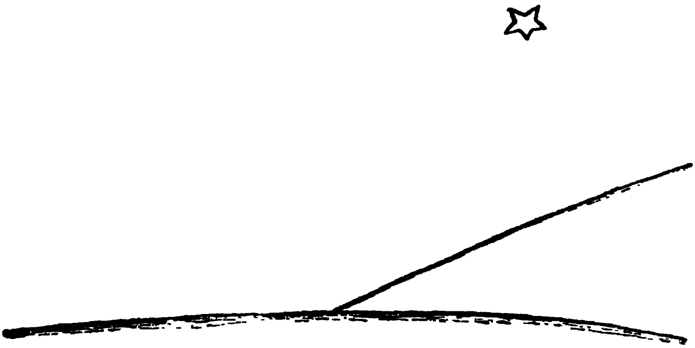
রাখে।” এই কথা ভাবতে ভাবতে আশ্বাস পাই···আর তারারা মৃদু হাসে।

মাঝে মাঝে ভাবি: “ভুল কি করে না লোকে? আর একটা ভুলই যথেষ্ট। ধরুন, এক সন্ধ্যায় ছোট রাজকুমার ভুলে গেছে ঢাকনির কথা···কিংবা ভেড়া নিজেই চুপি চুপি বেরিয়েছে রাতে···।” আকাশের নূপুররা তখন কাঁদে···।

রহস্য কথা বটে, গভীরতম রহস্য। আপনারা যাঁরা রাজকুমারকে ভালোবাসেন, আপনাদের পক্ষেও। বলুন দেখি, আপনাদের কাছেও সংসারে সব কিছুই কি বদলে যায় না, যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো জায়গায়, কি জানি কোনখানে, এক ভেড়া—অচেনা এক ভেড়া—খেয়ে ফেলে এক গোলাপফুল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকুন, মনে মনে জিগ্যেস করুন, ভেড়াটা খেয়েছে কি খায় নি ফুলটিকে। তখনই বুঝবেন, সারা বিশ্বে কি পার্থক্য।

কোনো বয়স্ক ব্যক্তি অবশ্য কোনো দিন বুঝবে না, প্রশ্নটির কত গুরুত্ব।



এই হল, আমার মনে, পৃথিবীর সুন্দরতম আর বিষণ্ণতম দৃশ্য। দৃশ্যটি আগের পাতায় আঁকা দৃশ্যেরই মতো। আরেকবার এঁকেছি, আপনাদের ভালো ক'রে বোঝাবার জন্য। ওইখানেই ছোট রাজকুমার পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল, অন্তর্হিত হয়েছিল এক দিন।

দৃশ্যটিকে দয়া ক'রে মন দিয়ে দেখে রাখবেন···চিনতে ভুল যাতে না করেন, একদিন যদি বেড়াতে যান আফ্রিকার মরুপ্রান্তরে। ওখান দিয়েই যদি যান, আপনাদের চরণে অনুরোধ—ব্যস্ত হয়ে যাবেন না; একটু দাঁড়াবেন···ঠিক তারাটির নিচে। তবে একটি ছেলে আপনাদের কাছে যদি আসে, ওর চুল যদি সোনালি রঙ, ও যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শুধুই খিল খিল ক'রে হাসে, তবে বুঝবেন, ও কে! তখন, দোহাই আপনাদের, আমার দুঃখের মর্ম যদি বোঝেন, শীঘ্রই খবর পাঠাবেন—ও ফিরেছে।